আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শরৎকালীন সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে গোটা বাংলা। এর মধ্যে একদিন এই কলকাতারই তাপমাত্রা ছুঁয়েছিল ৪৩ ডিগ্রি। গত পাঁচ দশকে এপ্রিলেই এরকম গরম নাকি পড়েনি। এর পর তো রইলই মে জুন জুলাই মাস। দাবদাহ তাহলে কি চলতেই থাকবে ? এটাই কি হয়ে গেল বাংলার গরমের হিসেব , যে হিসেব আগামী দিনে চলতেই থাকবে ! তাপে রেকর্ড করতে চলেছে কি বাংলা ! আমরা গরমের দেশের লোক বলে এতদিন যতই কেন না হইচই জুড়ে থাকি না আমরা এবারের এই গ্রীষ্ম কিন্তু ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে চালিয়ে খেলা তা-ই খেলে বোল্ড আউট করেছে বাঙালিকে । হাঁপাতে হাঁপাতে বাংলা বলছে শুনুন , মন্বন্তরে মরিনি আমরা , মারী নিয়ে ঘর করাই আমাদের দস্তুর। অতয়েব চিন্তা নেই দাবদাহের ক্রূর ভ্রুকুটিকে জয় আমরা করবই। দেখা যাক।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

দিন কয়েক ধরেই পারদ উঠছিল। কিন্তু কে ভেবেছিল বৈশাখের যত মধ্যিখানের দিকে এগোবে সেই ওঠা এইভাবে রীতিমতো চামড়া স্বালিয়ে দিতে থাকবে !

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর আশা দিতে চেষ্টা করছেন বটে যে, শিগগিরই তাপমাত্রা কমবে , ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও বলছেন কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল স্বয়ং। তাঁর কথা অনুযায়ী গত ৫০ বছরে নাকি এপ্রিল মে মাসে তাপমাত্রার এই জোরকদম ঘোড়দৌড় মোটে দেখা যায়নি। কাজের সূত্রে কলকাতার অদূরে গিয়ে নিয়মিত দেখতে পাচ্ছি এই গরমের জেরে এবং বেশ কিছুদিন বৃষ্টির দেখা না মেলায় রীতিমতো সমস্যা শুরু হয়েছে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে। চাষিরা বলছেন মাঠে এখন শাক রয়েছে , তীব্র এই তাপপ্রবাহের জেরে এই শাক শুকিয়ে যাবে বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা । সমস্যা থেকে রেহাই পাচ্ছে না বিভিন্ন আনাজও। জলের টান থাকায় পটল, শশা ইত্যাদির ফলন এবার কমবার আশঙ্কায় শঙ্কিত কৃষিজীবীরা। তবে তাঁদের আশ্বাস, রাজ্যে যে ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয় এই গরম তাতে প্রভাব ফেলতে পারবে না। অন্যদিকে কপালে ভাঁজ চা শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের। তাঁদের বক্তব্য যেহেতু চা চাষ অনেকটাই বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে, ফলে এবারে এখনো পর্যন্ত কম বৃষ্টি আর টানা গরম নিয়ে তাঁরা ভালোই চিন্তিত।

হিসেব বলছে অবস্থা কেবল আমাদের দেশেই যে এরকম বিপর্যস্ত তা কিন্তু নয়। কয়েক দিন আগের খবর অনুযায়ী গোটা এশিয়া জুড়েই নাকি অবস্থা এক অর্থে এরকমই সঙ্গীন। হিসেব বলছে চীন সহ মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম সহ এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগেই এবার অবস্থা রীতিমতো নড়েচড়ে বসার মতো। এবং হিসেব মতো এখনো যদি এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূ ভাগের মানুষ পরিবেশ নিয়ে যথার্থ অর্থে সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা না করেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ কেবল মরুভূমিতেই পরিণতি পাবে না , মানুষের পক্ষেও বিষয়টি মোটেই সুখকর দাঁড়াবে না

সূচিপত্র

ভোটের হাওয়া এবার বেশ গরম Page 6
স্বপনকান্তি সেন

জেন-ফাইভের দিকে তাকিয়ে সারা দেশ Page 11
দেবেশ কর্মকার । অনীক দাশ

ঐক্য রক্ষার আদর্শ বজায় রাখল আজাদ মুসলিম কনফারেন্স Page 14
নিজস্ব প্রতিনিধি

পুড়ছে বাংলা Page 19
অলোক ঘোষ

গরমের সমস্যা ও তার প্রতিকার Page 22
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

ইউরোপের ডায়েরি (চতুর্থ পর্ব) Page 24
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

ফিরে দেখা (তৃতীয় পর্ব) Page 30
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (তৃতীয় পর্ব) Page 33
বাবলু সাহা

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (তৃতীয় পর্ব) Page 36
আদিত্য ঠাকুর

চলচ্চিত্রে জীবনব্যাপী কৃতিত্বের জন্য 'রেড লোটাস' স্বীকৃতি পেলেন অপর্ণা সেন
নিজস্ব প্রতিনিধি Page 40

রঙে রেখায় রাজপুতানা (তৃতীয় পর্ব) Page 46
আদিত্য সেন

শোমিন-গেকি Page 51
রুডিগার টমজ্যাক

‘চালচিত্র এখন’ – অঞ্জন দত্তের সার্থক ভাবঘন ট্রিবিউট Page 56
যশোধরা রায়চৌধুরী

ক্যালিডোস্কোপে আকাশের ছায়াছবি Page 60
রুডিগার টমজ্যাক

টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মিলবে না আই পি এল দলের অনেককেই Page 66
কমল সোম

অন্য জগৎ Page 68
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

ভোটের হাওয়া এবার বেশ গরম

স্বপনকান্তি সেন

২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে 'নারদকাণ্ড' ফাঁস হয়েছিল। টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখা গিয়েছিল শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদেরা হাত পেতে টাকা নিচ্ছেন। রাজনৈতিক মহলে শোরগোল উঠলেও সেই ভোট বৈতরণী পার হতে তৃণমূলকে ততটা বেগ পেতে হয়নি। 'বিড়ম্বিত' হলেও শেষ পর্যন্ত ভোট আদায় করে নিতে পেরেছিল তৃণমূল। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের এখনো কয়েক দফা বাকি থাকার আগে হাই কোর্টের রায়ে চাকরি খুইয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার জন। এই রায়ে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে। এবং ঘরোয়া আলোচনায় তৃণমূলের নেতারা মেনে নিচ্ছেন, নারদকাণ্ডের থেকে এই ঘটনা ভোটে অনেক বেশি 'অভিঘাত' তৈরি করবে। দলকে অনেক বেশি 'বিড়ম্বনায়' পড়তে হবে।

নারদের গোপন ক্যামেরা অপারেশনে সৌগতকেও টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। এ-ও শোনা গিয়েছিল, তিনি টাকা নিয়ে বলছেন, 'সো মাচ মানি! থ্যাঙ্ক ইউ।' কিন্তু সৌগত-ঘনিষ্ঠেরা বলছেন, নারদের থেকেও নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল অনেক বড় ঘটনা। এর অভিঘাত সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তবে এর দায় সবটাই গিয়ে পড়ছে জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থের উপর।

বস্তুত, নারদকাণ্ড ছিল তৃণমূলের কয়েক জন নেতাকে জড়িয়ে। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর চাকরি এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িয়ে। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে নারদকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পরে নির্বাচনী প্রচারসভায় মমতা বলেছিলেন, আগে জানলে তিনি ওই অভিযুক্তদের ভোটে মনোনয়ন দিতেন না। ভোটের ফলাফলে প্রমাণ হয়েছিল, জনতা মমতার কথায় আস্থা জানিয়েছিল। উপরন্তু, ২০১৬ সালে মমতার সরকার মাত্রই পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, ২০২৪ সালে মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যে লড়ছেন, তিনি তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রিত্বে এসেছেন। এবং এই প্রথম একটি ভোটের আগে তৃণমূলের দু' জন মন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যেতে হয়েছে। প্রথম জন পার্থ। দ্বিতীয় জন জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিক। ফলে পরিস্থিতি এ বার 'কঠিন' বলে শাসক শিবিরের অন্দরেও আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, এ বার 'প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা' -র পরিমাণই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, ২০১৬ সালে বাম-কংগ্রেসের জোট বিরোধী শিবিরে থাকলেও তারা বিষয়টি নিয়ে সে ভাবে 'জলঘোলা' করতে পারেনি। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি যখন প্রকাশ্যে এসেছে, তত দিনে বিরোধী পরিসরে পোক্ত জায়গা করে নিয়েছে বিজেপি। নিয়োগ দুর্নীতিতে একের পর এক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে শিরোনামে থাকা বিচারপতি চাকরি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এবং তিনি লোকসভা ভোটেও লড়ছেন। অনেকের মতে, জনমানসে তৃণমূল সম্পর্কে যে 'নেতিবাচক' ধারণা তৈরি হয়েছিল, যখন মমতা-অভিষেক তা প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন, তখন হাই কোর্টের রায় নতুন করে শাসকদলের 'ক্ষত' তৈরি করে দিল। ভোটের মধ্যে তাতে প্রলেপ দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান তৃণমূলের একাংশ।

তবে আবার অন্য একাংশের মতে, এর 'দায়' যাবে পুরোপুরি হাই কোর্টের উপর। কারণ, রায় দিয়েছে হাই কোর্ট। শাসক শিবিরের এই অংশ বলছে, অভিযুক্তদের সঙ্গেই যোগ্যদেরও চাকরি বাতিল করে দিয়েছে আদালত। সেটা জনতা বুঝবে। তবে একই সঙ্গে সেই অংশের বক্তব্য, ভোটের প্রচারে বিষয়টা বোঝাতে হবে। এই সূত্রে মনে করা হচ্ছে, সরকারের 'ইতিবাচক' দিকগুলি চিহ্নিত করার বদলে এ বার 'ক্ষত' নিরাময়ে বেশি সময় দিতে হবে। বেশি চেষ্টা করতে হবে। ফলে প্রচারের অভিমুখও ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রত্যাশিত ভাবেই বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন। তাঁদেরও মতে, নারদের থেকেও বড় 'বিড়ম্বনা' নিয়োগ বাতিল। রাজ্যসভায় সিপিএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'নারদের সঙ্গে এর কোনও তুলনাই হয় না। কারণ, ওটা কয়েক জনের বিষয় ছিল। তাঁদের কেউ কেউ এখন বিজেপিতে। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে গোটা সমাজ জড়িয়ে রয়েছে। তৃণমূল এই ভোটে জবাব পাবে।'

প্রসঙ্গত, এসএসসি মামলায় আদালতের রায় অনুযায়ী, ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া সব প্রার্থীর নিয়োগ বাতিল। প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে কোনো চাকরির বৈধতা নেই। ফলে চাকরি গেছে প্রায় ২৬ হাজার ব্যক্তির। এসএসসিতে বেআইনি নিয়োগ করতে অনেক অতিরিক্ত পদ (সুপারনিউমেরিক পদ) তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে, যাঁরা অতিরিক্ত পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রয়োজনে ওই ব্যক্তিদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা, জানিয়েছে আদালত।

অভিযোগ, এসএসসিতে টাকার বিনিময়ে যাঁরা বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের নিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত শূন্যপদ ছিল না। তাই বেশ কিছু অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল। এগুলিকেই সুপারনিউমেরিক পদ বলা হচ্ছে। ওই পদগুলিতেই অযোগ্য প্রার্থীদের একটা বড় অংশকে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ। এ ভাবেই খাতায়-কলমে দেখানো হয়, তাঁদের নিয়োগ আসলে বৈধ। আদালত জানিয়েছে, এই অতিরিক্ত পদ তৈরি করে অবৈধ নিয়োগগুলিকে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাতেও সেই সিদ্ধান্তগুলির অনুমোদন হয়েছে।

এসএসসি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরের একটি চিঠি হাতে পেয়েছে সিবিআই, যা তারা আদালতে জমা দিয়েছে। সেখানে চিঠির বিষয় হিসাবে বলা হয়েছে, ওয়েটিং লিস্টের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার-পোষিত স্কুলে সহকারী শিক্ষক (কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা-সহ) এবং অশিক্ষক কর্মীর কিছু ‘সুপারনিউমেরিক পোস্ট তৈরির প্রস্তাব। রাজ্য মন্ত্রিসভাকে ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

আদালতের নির্দেশ, অতিরিক্ত পদ তৈরি করে বেআইনি ভাবে চাকরি দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের যে ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চালাবে। তদন্তের স্বার্থে সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা।

এসএসসি মামলার রায়ে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। চাকরি গিয়েছে ২৫,৭৫৩ জনের। আদালত এই সংক্রান্ত তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে সিবিআইকে। সেই সঙ্গে এসএসসি প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও

যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বেতন সুদ-সহ ফেরত দিতে বলা হয়েছে। বছরে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে ওই চাকরিপ্রাপকদের। লোকসভা নির্বাচনের আগে এসএসসি মামলায় হাই কোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারের কাছে বড় ধাক্কা। ইতিমধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে।

উত্তরবঙ্গের আটটি আসনের জন্য প্রচার করেছেন স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী। এর আগে আরও ছয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তৃতায় বারংবার শোনা গিয়েছিল 'মোদী' শব্দ। এবার যা শোনা গেল মাত্র একটি বার! বার তিনেক 'আমি' । কিন্তু 'মোদী' এক বারও নয়। বরং 'বিজেপি সরকার' বলেছেন মোদী। কিন্তু কেন? প্রথম দফার ভোটের পরে কি প্রচারের 'কৌশল' বদল করলেন তিনি ? রাজ্য বিজেপি অবশ্য সেটা মনে করছে না। তাদের মতে, এই রাজ্যের মোদীর বক্তৃতায় এই আকস্মিক বদলের পিছনে অন্য জল্পনাও কাজ করছে। প্রথম দফা ভোটের পরেই এই আলোচনা শুরু হয়েছে। তা হল ভোটদানের হার। গোটা দেশে ২১ রাজ্যের ১০২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল গত ১৯ এপ্রিল। সেটিই প্রথম দফা। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী প্রথম দফায় গড় ভোট পড়ে ৬৯.৩০ শতাংশ। পাঁচ বছর আগে ২০১৯ সালে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৬৯.৪৩ শতাংশ। সব মিলিয়ে ভোটের হার খুব কমেনি। তবে গোটা দেশের গড় বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে পশ্চিমবাংলা। রাজ্যের তিন আসনের গড় ৭৭.৭৫ শতাংশ ভোটই দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিজেপির 'শক্তি' বেশি, এমন রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৫৭.৬১ শতাংশ, রাজস্থানে ৫০.৯৫ শতাংশ। গড় ভোট সব

চেয়ে কম বিহারে। প্রথম দফায় রাজ্যের চারটি আসনে গড় ভোট পড়েছে ৪৭.৪৯ শতাংশ।

দেশের সর্বত্রই তীব্র গরম এবং তাপপ্রবাহ চলছে। সেই কারণেই কি ভোটদানের হার তুলনায় কম? এমন প্রশ্ন ছাড়াও দু' টি যুক্তি রয়েছে। অনেকে এমন মতামতও প্রকাশ করছেন যে, ২০১৪ বা ২০১৯ সালের মতো ভোট নিয়ে 'আগ্রহ' নেই ভোটারদের মধ্যে। কারণ, তৃতীয় বার মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা এক রকম নিশ্চিত বলেই প্রচার চলছে। তবে তৃতীয় প্রশ্নটি বিজেপির জন্য উদ্বেগের। বিরোধীরা এমন প্রশ্নও তুলছেন যে, এ বার 'মোদী হাওয়া' কম। তা-ই ভোটদানে উৎসাহও কম। সেটা সত্যি হলে মালদহে মোদীর বক্তৃতায় তারই ছাপ পড়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। সে জন্যই মোদীর মুখে 'মোদী' -র পরিবর্তে 'বিজেপি সরকার' । আর 'আমি' নেই। এ বার 'সরকার' । তবে বিহারের বক্তৃতাতেও মোদী বেশি করে ভোট দেওয়ার, সকাল সকাল ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বলেছেন বটে কিন্তু ফল কতটা কী হয় সেটাই এবার দেখার।

লেখা ২

জেন-ফাইভের দিকে তাকিয়ে সারা দেশ

দেবেশ কর্মকার | অনীক দাশ

অঙ্ক বলছে ভারতে এই মুহূর্তে ভারতীয় ভোটারের সংখ্যা ৯৭০ মিলিয়ন এবং তার মধ্যে ২১০ মিলিয়ন ভোটারেরই বয়েস ১৮ থেকে ২৯ এর মধ্যে। এই মুহূর্তে হিসেব যা তাতে দেখা যাচ্ছে এই তরুণ ভোটারদের মধ্যে ৪১ শতাংশই ২০১৯-এ ভোট দিয়েছিলেন বিজেপিকে আর মাত্র ১৯ শতাংশ কংগ্রেসকে।তাহলে প্রশ্ন হতেই পারে যে, দেশের তরুণ প্রজন্ম কি তাহলে গত কয়েক দশক ধরে বলতে চাইছেন বিজেপিই একমাত্র দেশকে তাঁদের ঈপ্সিত পথে নিয়ে যাবার জন্যে একমাত্র যোগ্য দল ? লোকনীতি-সিএসডিএস-এর পরিসংখ্যান বলছে ১৯৯৯ সালে ভারতে যে ভোটাররা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ১৮ থেকে ২৫ বছরের ভোটারদের গড় ছিল ৫৭ শতাংশ যেখানে পরিসংখ্যানের ভাষায় সমস্ত বয়েসের ভোটারের টার্ন আউট ছিল

৬০ %। শতাংশের হিসেবে তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা ২০০৪-এ ছিল ৫২ %, ২০০৯ –এ ৫৪ %, ২০১৪ –এ ৬৮ % এবং ২০১৯-এ সামান্য কমে ফের ৬৭ %।এবং প্রতিবারেই ভোটের ফল আমরা দেখেছি।এবার প্রশ্ন উঠে আসে এই যে তরুণ ভোটাররা ক্ষমতাসীন দলকে ভোট দিচ্ছেন সারা দেশে, এবং নানা কারণে তার সংখ্যা কমবেশি কমার বদলে বাড়ছে, এর কারণ কি ? কী চাইছেন তাঁরা ? বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে বেকারত্বের হার সারা দেশে প্রবল হয়ে উঠছে, তখন ? পাশাপাশি

কংগ্রেস যেখানে তাদের লক্ষ্যের মধ্যে এই বিষয়টিকেই আলাদা করে চোখে পড়ার মতো করে রাখছে সেখানে এবার কি তাহলে এই বিষয়টিই হয়ে উঠতে চলেছে ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাকিলিসেস হীল ?

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা মিহির রাজন জানাচ্ছেন তাঁর কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল শহর অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নের পরিকল্পনা, সমাজে ব্যাপকভাবে সমতা আনা ইত্যাদি। তাঁর মতে, দলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শই পারে একমাত্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আবার হাওড়ার বাসিন্দা , পেশায় ঘুরে ঘুরে বাসন বিক্রেতা শঙ্কর কিষণ খোন্দের বক্তব্য জিনিসের দামের উর্ধ্ব গতি রোধ করতে যে পারবে তিনি তাকেই চান দেশের পরিচালক দল হিসেবে। দুই সন্তানের পিতা শঙ্করকে চিন্তিত রাখে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণ , স্কুলের মাইনে এবং অন্যান্য ফিয়ের উর্ধ্বগতি। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বহরমপুর কেন্দ্রের ভোটার ইশফাক হুসেন কাওয়া কান্দি অঞ্চলের কৃষক বাড়ির ছেলে । গিটার বাজিয়ে গান করেন অবসর সময়ে। তাঁর বক্তব্য : যে দল এই ক্রমশ বাড়তে থাকা সাম্প্রদায়িক টেনশন কমাতে পারবে তাদেরকেই তিনি ভোট দেবেন। তার বক্তব্য : যে দল আমাদের বিজলি-সড়ক-পানির দাবি মেটাতে পারবে তারই দেশের কর্ণধার হবার যোগ্যতা আছে। তাঁর বিরক্তি উদ্রেক করে দেশে ক্রমেই বাড়তে থাকা কর্মহীনতা।

পশ্চিমবঙ্গের ছেলে অলক সেনের বাড়ি কলকাতায়, কিন্তু কাজের সূত্রে থাকেন অন্যত্র। বাড়ি এসেছেন দিন কয়েকের জন্য। প্রশ্নের জবাবে জানালেন অকারণ সংখ্যালঘু তোষণ, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের অপসারণ, পুলিস সহ সরকারের সমস্ত কাজে স্বচ্ছতা আনা ইত্যাদিই তাঁর ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এবারেও করবে। পেশায় ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নীরবকুমার কীর্তনিয়ার বাড়ি কলকাতার সল্টলেকে। পেশাসূত্রে থাকেন গুজরাতের খেদাতে। কথাসূত্রে বেরিয়ে এল তাঁর ক্ষোভ : এই পরিমাণ ইনফ্লেশান , বেকারত্ব, ডেভেলপমেন্টের নামে এরকম তঞ্চকতা কোনো দেশে দীর্ঘকাল চলতে পারে এমনটা ভাবা যায় না। তাঁর বক্তব্য এক্টাই : উই নীড টু রিথিঙ্ক ইন্ডস্ট্রিয়ালাইজেশন ,জেনারেট মোর এমপ্লয়মেন্ট, এনসিওর বেটার স্কিলিং অফ পিপল। নইলে আমরা মরে যাব। এই দেশটার অস্তিত্ব থাকবে না। পটনা বিহারের মেয়ে ফারহা নাজ কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফারহার নজর জব ক্রিয়েশনের দিকে। তাঁর বক্তব্য, যে দলই আসুক তাকে দেখতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে কমিউনাল হারমনি যেন বজায় রাখা যায়। এই সঙ্গে কার্বিং ইনফ্লেশান। না হলে দেশ কোনো দিন দাঁড়াতে পারবে না। পেশায় ফ্লোরাল ডিজাইনার করন নাগপাল দিল্লির ছেলে। সল্টলেক পাঁচ নম্বর সেক্টরে তাঁর অফিস। নাগপালের দাবি : এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশান , আপডেটিং ওল্ড ল' জ, লিগালাইজিং অফ সেমসেক্স ম্যারেজেস। তাঁর কথায়, আমরা বাস করব একুশ শতকে

আর আমাদের মানসিকতা হবে উনিশ শতকের এটা তো হতে পারে না। যে সরকার এগুলো নিশ্চিত করতে পারবে আমি তার জন্য শেষ অব্দি লড়ে যেতে রাজি। বললেন নাগপাল।

লেখা ৩

ঐক্য রক্ষার আদর্শ বজায় রাখল আজাদ মুসলিম কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশভাগ-বিরোধী ইতিহাসের অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সর্বভারতীয় আজাদ মুসলিম কনফারেন্স। সম্প্রতি আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের ৮৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল হাসিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশন । অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয় এই সেমিনারটি। সেমিনারের উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার এমপি, অ্যাডভোকেট বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুস্নাত দাশ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য তথা বিধানসভার স্পিকার, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আজীবন সদস্য প্রয়াত হাসিম আবদুল হালিমকে নিয়ে নির্মিত একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সেমিনারের সূচনা হয়। তথ্যচিত্রটিতে

হালিম সাহেবের সংগ্রামময় রাজনৈতিক জীবন ও বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তাঁর জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়। কীভাবে তিনি আমৃত্যু সাধারণ মানুষ ও দলিত মুসলিম সমাজ তথা পিছিয়ে পড়া নারীদের শিক্ষার প্রসারের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও সেগুলো বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে গিয়েছেন, তার নিপুণ চিত্রায়ণ ছিল সংক্ষিপ্ত ছবিটি। এরপর আয়োজকদের তরফ থেকে ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য ও সংকল্পের কথা ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়ে সেদিনের সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন হাসিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি ড. ফুয়াদ হালিম মহাশয়। অভ্যাগত বক্তাদের ডায়াসে আহ্বান করেন তিনি।

উদ্বোধনী ভাষণে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ সেকুলারিজমের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন রাজ্যসভার এমপি, অ্যাডভোকেট বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। বর্তমানে সেকুলারিজমের নামে যে সব ধর্মকেই তোল্লাই দেওয়ার রাজনীতি চলছে, তার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কোনও ধর্মকেই রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করতে না দেওয়া, ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তরেই থাকা উচিত, যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেকুলারিজমের প্রকৃত অর্থ সেকথা স্পষ্টতই তাঁর ভাষণে ব্যক্ত হয়। প্রসঙ্গত উঠে আসে স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের দাবিতে সংঘটিত ‘আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের’ মানবিক রাজনীতির ভূমিকার কথা।

এরপরই তিনি সেমিনারের সভাপতি রূপে আহ্বান করেন অধ্যাপক সুস্নাত দাশকে। সভাপতির সূচনা ভাসনে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সুস্নাত দাশ বহু ভাষাভাষী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য, হিন্দুর পাশাপাশি তৎকালীন দেশপ্রেমিক মুসলমানদের

অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রেক্ষিতে গঠিত আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের আহ্বানের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করে স্মরণ করিয়ে দেন – ধর্মনিরপেক্ষ অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্য সোচ্চার নেতা আল্লাহবক্স সুমরো সেইসময়ে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের হাতে নিহত না হলে সত্যিই হয়তো দেশবিভাজন রুখে যেতে পারত।

কে ছিলেন আল্লাহবক্স সুমরো? কী ছিল তাঁর সংগঠিত আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ ও ভূমিকা? সেই বিষয়েই একের পর এক বক্তা আলোকপাত করতে শুরু করেন। অনলাইন মাধ্যমে সেমিনারে বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক শামসুল ইসলাম ও শিলচর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ মজুমদার। প্রত্যেকের বক্তব্যেই ১৯৪০ সালের ২৭–৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়। অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী, মুসলিম সমাজের এক বৃহৎ অংশের সমর্থন গ্রহণপূর্বক মুসলিম লীগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ১৯৪০–এর ২৭ এপ্রিল আজাদ মুসলিম সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন আপসহীন লড়াকু নেতা আল্লাহবক্স সুমরো। এই কনফারেন্স ছিল অবিভক্ত, যৌথ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যতে বিশ্বাসী সেই হিন্দু ও মুসলিম ভারতবাসীর। যারা বলেন মুসলমান মাত্রেই স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে চ্যুত হয়ে পৃথক রাষ্ট্র চেয়েছিল তারা যে ভ্রান্তির শিকার, এই ঐতিহাসিক কনফারেন্সই তার প্রমাণ। অধ্যাপক শামসুল ইসলাম জানান, সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে ২৭ এপ্রিলের নির্ধারিত কর্মসূচি ১দিন থেকে ক্রমাগত চলতে চলতে ৩দিন ব্যাপি প্রসারিত হয়, যা ছিল ধারণার বাইরে। দেশবিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাতারে কাতারে জনসমাগম বাড়তে থাকে, এবং ৫ হাজারেরও বেশি মুসলিম মহিলা এই সমাগমে অংশ নিয়েছিলেন! যা ছিল

কল্পনাতীত বিষয়। শিলচর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ মজুমদার তৎকালীন আসামের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। জিন্নাহ তথা মুসলিম লীগের এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধতায় যে মুসলিম সমাজের এক বৃহৎ অংশ সোচ্চার হয়েছিল, রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে তা তিনি দেখান। মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এক কৃষকের জবাব ছিল, "আমি কিষান, চাষের জমিই আমার হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান..." এই ছিল প্রকৃতপক্ষে নীচুতলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

এদিন সেমিনারে পরবর্তী বক্তা হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন কেরালা কাউন্সিল ফর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের সদস্য অধ্যাপক পি.পি. আবদুল রাজ্জাক, সংগীতশিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার ও চিত্রনির্মাতা অনিন্দিতা সর্বাধিকারী। অধ্যাপক রাজ্জাক তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের আপসহীন প্রতিরোধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার মহাশয় আসামে মহরমের জারি গানের মতোই জঙ্গিয়া গীতের জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন যা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকেই সূচিত করে। সেসময়ে কাছাড়, করিমগঞ্জের বৃহত্তর অঞ্চলে ধ্বনি উঠেছিল "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই" । দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহান নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পাশাপাশি তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখান আল্লাহবক্স সুমরোর হত্যার ঘটনাটিকেও। প্রথমজনের মৃত্যুতে মৃত্যু হয়েছিল ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এর। আর ৪০ দশকের ১৯ মে মুসলিম লীগের ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন আল্লাহবক্স সুমরো, যার সাথে নিহত হয়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের শেষ স্বপ্ন, শেষ সম্ভবনা। চিত্রনির্মাতা অনিন্দিতা সর্বাধিকারীর সংবেদনশীল বক্তব্য ও মানবিক আকুতি এই ঐতিহাসিক অধ্যায়ের আলোচনায় নতুন প্রাণসঞ্চার করে। সেইসময় থেকে এইসময়, সমানভাবে চলে আসা বিভেদমূলক মানসিকতা, বর্বর, হিংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে আবেগজর্জরিত হয়ে পড়েন তিনি। অনুষ্ঠিত সেমিনারের পরিসমাপ্তি ভাষণে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস

চ্যান্সেলর, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জামিরুল্লাহ শাহ্ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সেমিনারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাতা ওলটাতে থাকে ৪০-এর অনালোকিত একেকটি অধ্যায়, মনে পড়ে যেতে থাকে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বক্তব্য – "ভারত বিভাজিত হোক না হোক, বাংলাকে ভাগ করতেই হবে.." বিভাজনের এই সুর যেমন একে একে দুটিকেই বাস্তবায়িত করেছে এটা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি এটাও, – "অগণিত মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ কংগ্রেসের সাথে আদর্শগত বিরোধে আলাদা হয়ে গেলেও, মুসলিম লীগে জয়েন করেনি " (হাবিবুল্লাহ মজুমদার)। তার সাক্ষ্যই বহন করছে ঐতিহাসিক আজাদ মুসলিম কনফারেন্স।

পরিশেষে, আলোকচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে 'Muslim against partition of India – The forgotten chapter' শীর্ষক অ্যাজেন্ডার তরফে ইরফান হাবিব, নাসিরুদ্দিন শাহ্, সজল নাগ এবং দেশের বহু মান্যগণ্য ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক, শিল্পীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এদিন সেমিনারের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।

পুড়ছে বাংলা

অলোক ঘোষ

পুড়ছে কলকাতার মাটি। অন্ততপক্ষে এলেখা যখন লিখছি তখ৯ন পর্যন্ত দিগন্তে বৃষ্টি দূরস্থান, কোথাও দেখা পর্যন্ত নেই মেঘের। অর্থাৎ বৈশাখের এই জ্বলন শান্ত করার যে ‘দাওয়াই’ , সেই কালবৈশাখীর চিহ্নমাত্র নেই। চৈত্র শেষ। শেষ অর্ধেক বৈশাখও। অন্য বছরে এই সময়ে অন্তত দু’ টি আকাশ আঁধার করা কালবৈশাখী বয়ে যায় শহরের বুকে। কিন্তু এ বছর তার দেখা নেই কেন? কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, একটি নয়, গোল বেঁধেছে দু’ টি। আর তার জন্যই পথ ভুলেছে কালবৈশাখী।

নামে বৈশাখী থাকলেও কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয় চৈত্রের শেষ থেকেই। এপ্রিল মাস অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডারে চৈত্রের শেষার্ধ আর বৈশাখের প্রথমার্ধই কালবৈশাখীর

অনুকূল সময়। কিন্তু এ বছর এপ্রিলে কালবৈশাখী তো দূর চাতক মহানগরের জ্বালাজুড়োনো সামান্য ঝড় কিংবা ছিটেফোঁটা বৃষ্টির শিকেও ছিঁড়ছে না।

আবহাওয়া দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, এপ্রিলে গড়ে দুটো তো বটেই, কখনও কখনও তিনটি বা তার বেশি কালবৈশাখী হয় কলকাতায়। এ ছাড়া ছ' সাত দিন ঝড়বৃষ্টি হয়। মৌসম ভবনের হিসাব বলছে, এপ্রিলের কলকাতায় গড়ে অন্তত তিন দিন বৃষ্টি হয়। গড় বৃষ্টির পরিমাণ থাকে ৫৫ মিলিমিটার। তুলনায় এ বছরের এপ্রিলের হিসাব চমকে দেওয়ার মতো। কালবৈশাখী হয়নি। ছোটখাটো ঝড় হয়নি। বজ্রগর্ভ মেঘের দেখা নেই। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছিল ৭, ৮ এবং ১১ এপ্রিল। এর মধ্যে ৭ তারিখই মাপার মতো। ০.৫ মিলিমিটার। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৮ এবং ১১ তারিখ শুধু বোঝা গিয়েছে যে, বৃষ্টি হয়েছে। তার পর থেকে আর বৃষ্টির মুখ দেখেনি কলকাতা। ১১ তারিখের পর থেকে মঙ্গলবার ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত শুধুই গরম আর দাবদাহ। প্রতিদিন ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার নতুন নতুন রেকর্ড ভাঙছে কলকাতা।

আবহাওয়াবিদেরা জানাচ্ছেন গোল পেকেছে দু' টি জায়গায়– এক, বঙ্গোপসাগর এবং দুই, ঝাড়খণ্ড-বিহারে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের কথায় বঙ্গে চৈত্র-বৈশাখে কালবৈশাখী বা ঝড়বৃষ্টি হয় বঙ্গোপসাগর থেকে আসা 'অ্যান্টি সাইক্লোন' বা বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের কারণে। বঙ্গোপসাগর থেকে ওই ঘূর্ণাবর্ত আমাদের রাজ্যে ঢোকে। অন্য দিকে, ঝাড়খণ্ড-বিহারেও একটি শুষ্ক এবং তপ্ত বলয় তৈরি হয়, যা বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টানে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের ওই বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত রাজ্যের উপর দিয়ে ঝাড়খণ্ড বিহারে ঢুকে আবার রাজ্যের দিকে ফিরে আসে। ফলে এই সময় দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় একটা অস্থিরতা তৈরি হয়। সন্ধ্যার দিকে দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে। তখনই হয় কালবৈশাখী। সঙ্গে বজ্রগর্ভ মেঘ আর বৃষ্টিও নামে।

আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, এ বছর বঙ্গোপসাগরে ওই বিপরীতমুখী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে না। যেটুকু হচ্ছে, তার সবটাই চলে যাচ্ছে পড়শি দেশ বাংলাদেশের দিকে। ফলে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের লাভ পাচ্ছে বাংলাদেশ। অন্য দিকে, ঝাড়খণ্ড বা বিহারেও শুষ্ক বলয় তৈরি হয়নি। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে আর্দ্রতা টেনে আনার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি সেখানেও। গোলমাল বেঁধেছে সেখানেই।

এর ফলে বঙ্গে আর্দ্রতা প্রবেশ করছে না। অন্য দিকে, পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে শুষ্ক এবং তপ্ত হাওয়া, সাহারা মরুভূমির দিক থেকে ক্রমেই ঢুকছে রাজ্যে। ফলে বাংলার

চিরচেনা প্যাচপেচে আর্দ্র গরম হারিয়ে দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গে চলছে দিল্লির মতো গরম আর শুষ্ক আবহাওয়া।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী রবিবার থেকে এই বিপরীতমূখী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বঙ্গে। সে ক্ষেত্রে আর্দ্রতা বেশি হলে বাংলার কপালে কালবৈশাখী শিকে ছিঁড়তে পারে কি? বৈশাখের শেষ অর্ধেক এখনও বাকি। আপাতত তাই হাওয়া অফিসের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকেই তাকিয়ে দিন গুনছে তিলোত্তমা।

লেখা ৫

গরমের সমস্যা ও তার প্রতিকার

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

গরমে সবাই নাজেহাল। গ্রীষ্মকালে গরম তো হবেই। কিন্তু সেই গরম যখন সহ্যর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখনই দেখা দেয় নানা সমস্যা।

গরম থেকে যে সব সমস্যা হতে পারে সেগুলি হল, হিট র‍্যাশেস, হিট ক্র্যাম্পস, হিট এক্সহশন, হিট স্ট্রোক ইত্যাদি। বাচ্চা বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে ,বা যাদের অন্যান্য রোগ, যেমন ডায়াবেটিস, উচচ রক্তচাপ ,হার্টের অসুখ প্রভৃতি আছে, তাদের এগুলি বেশী হয়। কৃষক, নির্মাণকর্মী ,ট্রাফিক পুলিশ, মিলিটারি, অ্যাথলিট নানা ক্ষাত্রে যারা জড়িত তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

হিট র‍্যাশেস হলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে অ্যালারজি জনিত চুলকানি ও লাল দাগ দেখা দেয়। অতিরিক্ত গরম ও ঘামের ফলে স্বেদগ্রন্থি বন্ধ হয়ে গেলে এই অবস্থা হয়। হিট ক্র্যাম্পস হলে শরীরে ব্যথা, বিক্ষেপ বা ক্র্যাম্পস দেখা দেয়। হিট এক্সহশনে শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীর শুকিয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে। হিট স্ট্রোকে রোগী প্রায় অজ্ঞান বা সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা থাকে, রক্তচাপ ভীষণ কমে যায়, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। গরমের তীব্রতা ভেদে এই সব সমস্যা হতে পারে। আবার গরমে ডায়রিয়া র সমস্যা বেশি দেখা যায়।

চিকিৎসা

● হিট র‍্যাশেস হলে ঠান্ডা জায়গায় চলে যেতে হবে, কোল্ড কম্প্রেস করতে হবে । ল্যাক্টোক্যালামাইন লাগানো যেতে পারে।
● হিট ক্র্যাম্পস হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠান্ডা জায়গায় চলে যেতে হবে, প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইটস খেতে হবে ।
● হিট এক্সহশন ও হিট স্ট্রোকের এর ক্ষেত্রেও প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইটসদিতে হয়। খুব মারাত্মক হিট স্ট্রোকে স্যালাইনও দিতে হতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন । হাসপাতালে ভর্তিরও প্রয়োজন হতে পারে।

যাতে এই সব সমস্যা না দেখা দেয়, তার জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে –

● গরমের মধ্যে বেশি পরিশ্রম করা যাবে না, হাল্কা পোষাক পরতে হবে, সম্ভব হলে অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করতে হবে ।
● গরমের সময় প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইটস নিতে হবে । তরমুজ জাতীয় রসাল ফল খাওয়া ভালো। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।
● বাচ্চা বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে ,অথবা যাঁদের বিভিন্ন রোগ আছে, বিশেষ করে তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

অর্থাৎ সমস্যা হতেই পারে, তার জন্যে সমাধানও অবশ্যই আছে। সেই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।অযথা আতঙ্কিত না হয়ে গ্রীষ্মকে যথার্থ ভাবে উপভোগ করতে জানতে হবে। ব্যবস্থা রাখতে হবে প্রতিকারের।

ইউরোপের ডায়েরি (চতুর্থ পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

এবারে ইতালি ভ্রমণ। যেতে যেতে বাস দাঁড়িয়ে পড়ল এক ফিলিং স্টেশনের পাশে। আমাদের এখানে যেমন পেট্রোল পাম্প ,ইউরোপে রয়েছে ফিলিং স্টেশন, সেখানে কাফে, রেস্টুরেন্ট, অন্যান্য দোকান, ওয়াশরুম , এইসবও রয়েছে । সুবিধেও হয় সবার। আমরা নেমে পড়লাম কফি খেতে। দু একটা জিনিসও কেনা হল। বেরিয়ে এসে শুনলাম এক দুসংবাদ। বাস খারাপ হয়ে গেছে। ড্রাইভার চেষ্টা করছে যদি ঠিক করা যায়।

কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। আমাদের গ্রুপে দু একজন ইন্ডিজনিয়ার আছেন। তার মধ্যে একজন, মিঃ শ্রীনাথ , তিনিও অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছু লাভ হল না।

তখন চেষ্টা করা হল কোনো মেকানিক কে আনার জন্য। তাতে কত সময় লাগবে তার ঠিক নেই।

রূপকথা অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে লাগলো। আমরা সবাই গল্প করতে লাগলাম। এক ঘন্টা পরে দুজন মেকানিক এলো আর সব ঠিক করল।

যাক, বাঁচা গেল। বলল নীলাঞ্জনা।

সত্যিই, রাস্তায় এইভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না। বললেন মিসেস শ্রীনিবাসন । বাস চলতে শুরু করল। দীর্ঘ যাত্রার পরে আমরা পৌঁছলাম ইতালির রাজধানী রোম এ। রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে ঘরে গিয়ে বসলাম।

রোম প্রাচীন নগরী। ঘরের আসবাবপত্রতেও তাই হয়তো প্রাচীনতার ছোঁয়া। আলোগুলোও সেরকমই । ঘরের চাবিটাও ভীষণ বড় আর ভারী।

ক্লান্তির ছাপ সবার চোখেমুখে । খানিক কথাবার্তার পরে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া হল। তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম সেই মধ্যযুগীয় পরিবেশের ঘরের বিছানায় । কাল রোম ভ্রমণ।

ইতালি পশ্চিম ইউরোপের একটি দেশ, যার উত্তর প্রান্তে রয়েছে আল্পস পর্বতমালা , এবং চারপাশে রয়েছে ফ্রান্স , সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া , স্লোভেনিয়া ।এই দেশ ছিল মধ্যযুগে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের জন্মস্থান ও

কেন্দ্রস্থল ।এই সময়কাল চিহ্নিত করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে রূপান্তরের সময়কে । লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো , তিতিয়ান, রাফেল প্রভৃতি শিল্পী ভাস্কররা সমৃদ্ধ করেছেন সেই সময়কে।

রোম হল এই দেশের রাজধানী এবং এক প্রাচীন নগরী – রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ভ্যাটিকান সিটি আছে সেখানে। সেখানেই থাকেন পোপ, খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু ।

আর ইতালি বলতে আমাদের মনে ভেসে আসে ইতালিয়ান খাবার পিৎজা , ইটালিয়ান মার্বেল, ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনি, অ্যাম্ফিথিয়েটার ,পিসার হেলানো বা লিনিং টাওয়ার, ভেনিসের জলনগরী বা মার্চেন্ট অফ ভেনিসের কথা।

বিখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব একসময় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ।কথাই তো আছে – রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে।

শুরু হল রোমদর্শন । ভ্যাটিকান সিটিতে সেন্ট পিটার' স ব্যাসিলকা চার্চের কাছে বাস থামল। আমরা সবাই নেমে পড়লাম। প্রথমে আশপাশটা ঘুরে দেখা হল ।সুন্দর বাগান, ফোয়ারা সব রয়েছে।

ভ্যাটিকান সিটি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা। এই জায়গার সবকিছু পোপের অধীনে। একে এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও বলা যায় ।

পুরোনো ব্যাসিলিকাটি নির্মিত হয়েছিল পঞ্চম শতাব্দীতে ,রোমান সম্রাট কনসট্যানটাইনের আমলে। নতুন ব্যাসিলিকাটি তৈরী করা হয় ষোড়ষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে । এটি একটি রেনেসাঁ যুগের ভাস্কর্য । বিখ্যাত স্থপতি, যেমন, মাইকেল অ্যান্জেলো ,রেমব্রান্ট , রাফেল এবং আরও অনেকে যুক্ত ছিলেন এই সৌধের নির্মানের সঙ্গে।

এর স্থাপত্যশৈলীতে রয়েছে বাইজানটাইন ও রোমান শৈলী, উভয়েরই ছোঁয়া। ভেতরে আছে বিখ্যাত মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর পিয়েটা , সেন্ট পিটারের সমাধি, সেন্ট পিটার ' স চেয়ার, গম্বুজ, বার্নিনির বান্ডাকচিনো প্রভৃতি । ইউনেস্কো থেকে এই স্থানকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়।

ভেতরে ঢুকে দেখা হল সবকিছু। বেশ ভালো লাগলো সবারই ।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফলের রস খাওয়া হল। ভারতীয় দোকান। এক জায়গায় জুয়েলারি বিক্রি করছে একজন গুজরাটি। নীলাঞ্জনা কিনল। এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ভাস্কর্যের চিহ্ন।

এবারে একটু খাওয়াদাওয়া করে নেওয়া হল। তারপর আবার সিটি ট্যুর। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা স্তম্ভ , প্রাচীরের টুকরো প্রভৃতি ,পর্যটকদের দেখার জন্য। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ।

আবার দেখা গেল কেউ কেউ নাইট সেজে অথবা ডাইনী বা উইচ সেজে দাঁড়িয়ে আছে, আর লোকজন ইউরো দিয়ে তার সঙ্গে ছবি নিচ্ছে। আমাদের দেশের বহুরুপীর মত ব্যাপার আর কি।

দেখা হল কলোসিয়াম, পৃথিবীর অন্যতম এক আশ্চর্য স্থাপত্য। এটি হল একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার ,যেখানে প্রাচীনকালে অনুষ্ঠিত হত বন্দী বা ক্রীতদাসদের সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ, গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ, নাটক, আরো কতো কি। মানসচক্ষে ভেসে ওঠে সংঘর্ষের সেই সব ভয়াবহ দৃশ্য। এই স্থাপত্য শুরু হয় ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ,সম্রাট ভেসপাসিয়ানের আমলে, আর শেষ হয় ৮০ খৃষ্টাব্দে ,সম্রাট টাইটানের সময়ে। পরবর্তীকালে এই স্থান অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে।

এখন তো এর ভগ্নদশা । কিন্তু প্রাচীন স্মৃতির পরশ মেখে বসে আছে। এর ছোঁয়া পেতেই তো এখানে আসা।

যেন চলে এসেছি এক অন্য জগতে। আমি বললাম।

একদম ঠিক। বলল নীলাঞ্জনা।

বেরিয়ে আসার পরও মনের মধ্যে রেশ থেকে গেল এই জায়গার। ভালোই লাগছিল প্রাচীন নগরীর রাস্তা দিয়ে চলতে। মনে হচ্ছিল যেন সময়ের সরণী বেয়ে আমরা পৌঁছে গেছি সেই প্রাচীন যুগে। পরণে আমাদের যোদ্ধার পোষাক – বর্ম, শিরস্ত্রাণ , কোষবদ্ধ তরবারি। এইসব ভাবতে ভাবতে বাসে গিয়ে উঠলাম।

হোটেলে ফিরে সবাই গল্প করতে লাগলাম আজকের দেখা নিয়ে।

বইয়ের পাতার সব জিনিস আজ চলে এলো চোখের সামনে। বলল নীলাঞ্জনা।

সবার অনুরোধে পান্ডেজি একটা গান ধরলেন, মহম্মদ রফির এক বিখ্যাত গান। তারপর আরো কয়েকটা। ওনার গানের গলা খুব সুন্দর।

দিল খুশ হো গয়া। বললেন শর্মাজী ।

আমি দেখে নিলাম তোলা ছবিগুলো ভালোই এসেছে।

রূপকথাও একটা গান করল। ভালো লাগল সকলের। আমাদেরও আনন্দ হল।

এবারে রাতের খাওয়া। তারপর বিশ্রাম।

কাল যাওয়া হবে পিসার হেলানো টাওয়ার বা লিনিং টাওয়ার অফ পিসা, ফ্লোরেন্স দেখতে।

এর পর আগামী সংখ্যায়

স্ফিরে দেখা (তৃতীয় পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

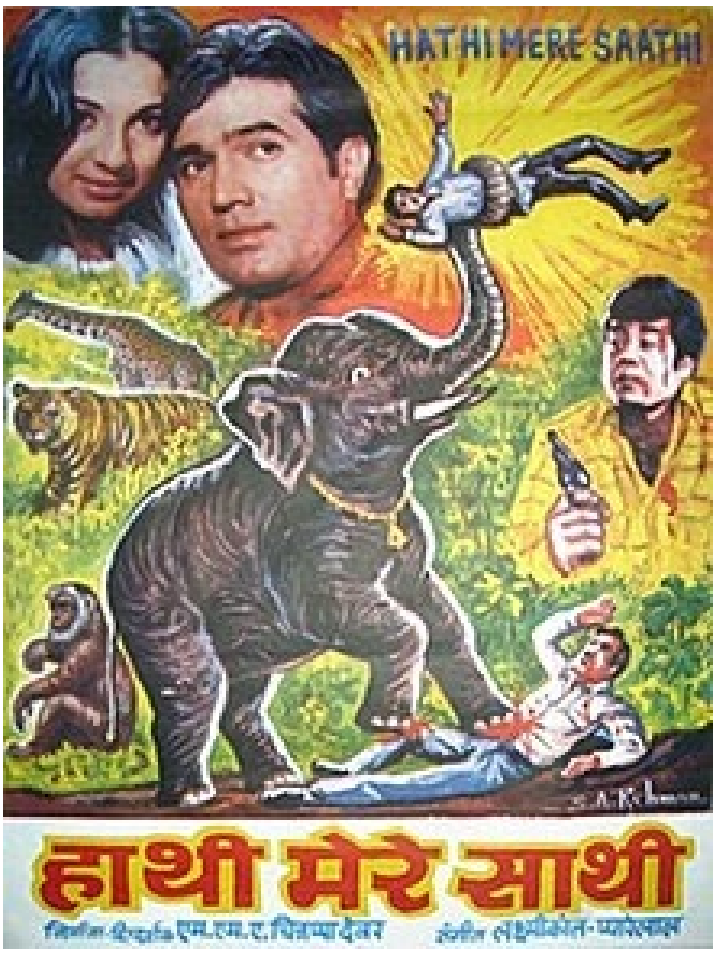

এবার শুরু করি সাবেক বেহালার সিনেমাহলগুলিকে নিয়ে।

বেহালার তখনকার সিনেমাহল নিয়ে বলতে গেলে সর্বপ্রথমেই চলে আসে অধুনা ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকে ' সুচিত্রা ' সিনেমা হলের কথায়।

এই হলের কথা বলতে গেলে তখনকার হলিউড-বম্বে এবং টালিগঞ্জের বিখ্যাত সব সিনেমার কথা চলে আসবেই। কারণ, এখানেই একেবারে সেই ছোটবেলা থেকে দেখেছিলাম (কিছুটা বাবা-মায়ের প্রশ্রয়ে তো বটেই) ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ' , ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সব ছবি, যেমন : '৮০তে আসিওনা' , 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' , 'ভানু পেলো লটারী' ইত্যাদি।বোম্বে চলচ্চিত্রের 'হাতি মেরে সাথী' , ইংরেজি সিনেমায় 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দি সি' , 'গানস অফ নাভারোন' , 'হাতারি' ইত্যাদি।

এবং,এই তখনকার 'সুচিত্রা' হলে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ ছিল হলের একই ছাদের নিচে তখনকার কলকাতার সুবিখ্যাত বড়দার হোটেল / রেস্টুরেন্ট ‘বেঙ্গল হোটেল'-এর মোগলাই পরোটা আর মাটন কষা।

সিনেমা এবং বড়দার হোটেলের খাবার খাওয়া সিনেমাপ্রেমীদের কাছে একেবারে সম্পৃক্ত ছিল।

এই হলের কথা বলতে গেলে তখনকার হলিউড-বম্বে এবং টালিগঞ্জ এর বিখ্যাত সব সিনেমার তখনকার বেহালায় যে ক'টি সিনেমা হল ছিল, তারমধ্যে একমাত্র সুচিত্রা হলেই সেই সময়ের প্রখ্যাত বাংলা ছবির পরিচালকদের আর্ট ফিল্ম গুলি দেখানো হত (এবং তার মধ্যে বেশকিছু ‘ইলোরা' সিনেমা হলেও)। যেমন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ। এসব সিনেমা দেখার দর্শক অনেক কম হলেও হল কর্তৃপক্ষ তাতে আমল দিতেন না।

আর বিশেষভাবে বলতে হয় উত্তম কুমার অভিনীত ছবিগুলি এই হলে রিলিজ করবেই। তখনকার দর্শকগণ মুখিয়ে থাকতেন এর জন্য।

পরে আবার সুচিত্রা হল প্রসঙ্গে আসছি। তার আগে আরেকবার ' পিয়াসী ' হলের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

পিয়াসী যেহেতু প্রথমে একটি পারিবারিক হল হিসেবে নির্মিত হয়েছিল, সেহেতু এই হলে কোনও দ্বিতল বা আলাদাভাবে ব্যালকনি সিট ছিল না। অন্যান্য হলের একতলার মতোই একেবারে

প্রথমদিকের সারিতে ছিল ফ্রন্ট স্টল অর্থাৎ সেই ৩৭ (পরবর্তীকালে যথাক্রমে ৬০-৭৫-৯০-১.২৫)পয়সার। তারপর মিডল, রেয়ার এবং আপার স্টল।

এই হলে মিডল স্টলের টিকিট কাটতে গেলে অনেক দর্শকই বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কারণ, হলের একটি চওড়া পিলার বা থাম। যে দুর্ভাগা দর্শকের হাতে সেই থামের ঠিক পিছনের আসনটি পড়ত, তিনি সিনেমা দেখার সময়ে পড়তেন ঘোর বিড়ম্বনায়। কারণ তার সামনেই থামের আড়াল হওয়ার কারণে মাথাটাকে হয় ডানদিক, নয় বামদিকে ঝোঁকাতে হতো। ফলে তার ঠিক পিছনের আসনে বসা দর্শকের গালাগালি ছিল অবধারিত।

এই হলে বরাবরই চলত তৎকালীন হিন্দী মসালামার্কা ছবি। ফলে দর্শক হিসেবে থাকতো অকালপক্ক ছেলে ছোকরা ও যুবক তরুণদের দল। সিনেমা চলাকালীন হলে দর্শক আসন থেকে কোনও চোখা ডায়লগ বা চটুল গানের সময় তীব্র সিটি বেজে উঠতো।

তবে এখানে পুরোপুরি কমার্শিয়াল ছবি চললেও, কোনও রকম অশ্লীল ছবি চলত না।

এবং এই হলে মোট তিনটি শো চলত। ম্যাটিনি - ইভিনিং এবং নাইট। কোনও মর্নিং শো চলত না।

লেখা ৮

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (তৃতীয় পর্ব)

বাবলু সাহা

রাতের থাকার ব্যবস্থা তো পাকা হয়ে গেল। এরপর শুরু হল মুখ্য বনপালের (আমার দুর্ভাগ্য, ওনার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না) সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় পর্ব।

ওনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, উনি অত্যন্ত সুভদ্র এবং অমায়িক সজ্জন ব্যক্তি। নিজের বাড়িতে স্ত্রী এবং একমাত্র ছোট সন্তানকে রেখে উনি এই বন বাংলোয় একাই থাকেন। ওনার এখানকার চমকপ্রদ কাহিনী শুনে আমরা যারপরনাই অভিভূত।

সেসব সত্য গল্পে পরে আসছি। তার আগে বলে নিই, আমরা দুজনে যেহেতু প্রায় মাঝ দুপুরে পৌঁছেছি, সেহেতু সবার আগে উনি ওনাদের ব্যক্তিগত কিচেনে আমাদের তখনকার মতো দুপুরের লাঞ্চের বন্দোবস্ত করতে। কারণ, ওখানে সর্বমোট চার-পাঁচজন লোক। তাদের মধ্যে একজন অস্থায়ী যে বয়স্ক ব্যক্তি, তাকে উনি নিজে ওখানে থাকা-খাওয়া এবং কাজের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সাহায্য করেছেন।

সেইমুহূর্তে আগেই তাদের সবার রান্না তৈরি হয়ে গেছে।

উনি বললেন, আমাদের দুজনকে নিয়ে সবার রান্না করা খাবার একসাথে ভাগ করে ঠিক হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও ওই বয়স্ক মানুষটি আমাদের ঘরের তালা খুলে দিয়ে ছুটলেন কিচেনে, তৎক্ষণাৎ আমাদের জন্য ডিমের কারী রান্না করবেন বলে। আমরা ঘরে প্রবেশ

করে দেখলাম মাঝারি মাপের সাদামাটা ঘর। ডানদিকে দুজনের ভালোভাবে শোয়ার জন্য বিছানা। তার লাগোয়া একটি জানলা, যেটি দিয়ে বিস্তৃত সজ্জিত বনাঞ্চল।

ঘরের ভিতর দিয়ে আরেকটি প্রশস্ত ঘেরা জায়গা, পাশেই দুটি বাথরুমে জল তুলে নিয়ে স্নানের ব্যবস্থা আছে। ঘরটি বেশকিছুদিন অব্যবহার্যভাবে পড়ে থাকার দরুণ মেঝেতে ধুলোর পাতলা আস্তরণ এবং সিলিং এ ঝুল আটকে আছে। ওনারা লোক পাঠাবার আগেই আমি ঝুলঝাড়ু আর ফুলঝাড়ু হাতে নিয়ে গোটা ঘরটি একেবারে পরিস্কার সাফসুতরো করে ফেললাম।

একটু পরেই বিছানায় পরিস্কার চাদর-বালিশ দিয়ে গেল।

এবার আমরা চললাম ভিতরের ঘেরা জায়গায় একটি বড় ঘাট বাঁধানো পুকুরের ধারে। সেখানে পলাশের আনন্দ দেখে কে।

গামছা কোমরে বেঁধে সাথে সাথেই জলে ঝাঁপ দিয়ে বেশকয়েক চক্কর সাঁতার কেটে নিয়ে পাড়ে উঠল।

এরপর কিচেনে গিয়ে দেখি টেবিলে থালায় ভাত বাড়া হয়ে গেছে। সাথে

বনদপ্তরের নিজস্ব ক্ষেতের সব্জি, ডাল, দেশি মুরগির ডিমের কারী খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলাম।

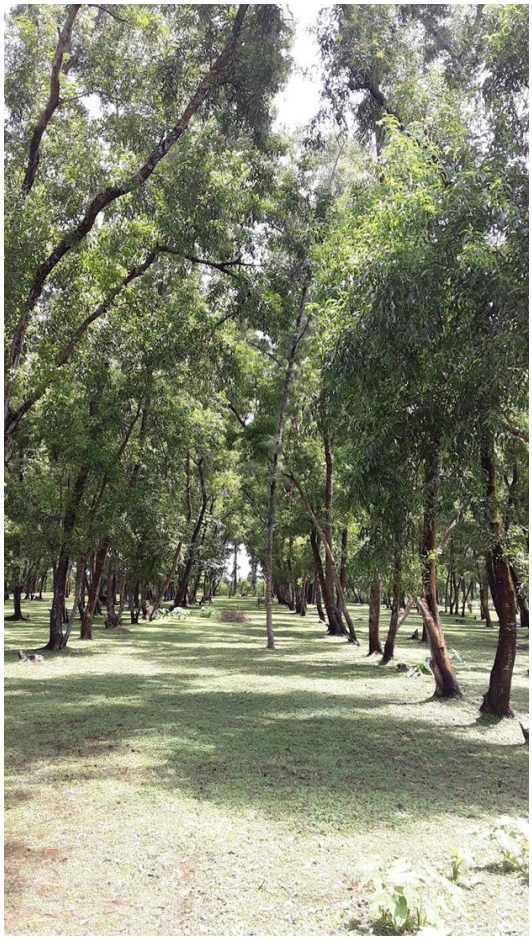

খাওয়ার পর ঘরে খানিক বিছানায় গড়িয়ে আবার বেরোলাম ওই বয়স্ক অস্থায়ী কর্মীর সাথে। উনি এই বাগানের গল্প করতে করতে ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে থাকলেন। ওনার মুখেই শুনলাম, আমাদের মূল লক্ষ্য সেই ঐতিহাসিক পরিত্যক্ত জেলিংহ্যাম বন্দর একেবারে কাছেই।

ছোট পেঁপে গাছ এবং কলাগাছে প্রায় মাটির গা ঘেঁষে প্রচুর ফলন হয়েছে। আমাদের চোখে-মুখে মুগ্ধতা দেখে উনি বললেন, রাতে আমাদের ডিনারে এই পেঁপের তারকারী আর রুটি বানিয়ে খাওয়াবেন।

অনেকটা জায়গা জুড়ে ওই আগে বলা কাঁকড়াদাঁড়া ম্যানগ্রোভ গাছের ছোট ছোট চারা খুব যত্ন করে সুবিন্যস্তভাবে রোপণ করা । এসব উনি এক হাতেই পরিশ্রম করে করেছেন। এসব দেখে আবার ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে সামনের জানলা দিয়ে হঠাৎ চোখে পড়লো, বাইরে সার সার দিয়ে বিশাল আকৃতির গাছের কাটা গুঁড়ি (যেগুলি প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে ভেঙে পড়ে) রাখা, দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থেকে সেই গুঁড়িগুলোয় বিশেষ বিরল প্রজাতির একধরনের অপূর্ব সুন্দর ছত্রাকের সমাহার।

সাথেসাথেই ক্যামেরা হাতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এর পর আগামী সংখ্যায়

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (তৃতীয় পর্ব)

আদিত্য ঠাকুর

নানা সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি সরস্বতীর বর্ণনা করেছেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন আকাশগঙ্গা এই অংশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন! হয়তো সেই ছিন্ন অংশেই দেবী কল্পিত। কখন তিনি দ্বিভূজা কোথায়ও বা তিনি চতুর্ভূজা। কোথাও বীণাহস্তে, কোথাও জপমালা, কোথাও পুস্তক ধারণ করেছেন হাতে। শ্বেতশুভ্র আকাশগঙ্গায় বিভিন্ন কালের মানুষ বিভিন্ন রূপে সরস্বতীকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রায় সর্বত্রই তিনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, হংসারূঢ়া, কোথাও ত্রিনেত্র। রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণ থেকে সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র তুলে ধরেছেন, "ভদ্রকাল্যৈই নমো নিত্যং সরস্বত্যৈই নমো নমঃ।" অর্থাৎ সরস্বতী এবং ভদ্রকালী এক ও অভিন্ন। ভদ্রকালী অতসী কুসুম – শ্যামা, দুর্গার এক রূপ। এখানে এসে একটু অবাক হতে হয় "শ্যামা" রূপ বলা হচ্ছে কেন, ছায়াপথ তো শুভ্র আলোর চাদর? উত্তরে বলা যায় ছায়াপথের কিছু অংশ মহাজাগতিক ধুলোর মেঘে (Interstellar clouds of cosmic Dust) পূর্ণ। সেই স্থানগুলো যেন সাদা আলোর নদীর মাঝে তমসা নদী (The Grear Rift or Dark Rift or commonly Dark River) বহমান বলে প্রতীয়মান হয়। আকাশগঙ্গার দিকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে

এই “তমসা-নদী” -কে দেখা যায়। বাল্মিকী রামায়ণেও এই তমসা নদীর কথা বলা আছে। স্বয়ং মহর্ষি বাল্মিকী তমসা নদী তীরে বিচরণ করছেন (ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র, পৃ-১০৮), এই কথা রামায়ণে বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগের জ্যোতির্বিদরা রাতের আকাশকে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করতেন, মনে হয় তাঁরা আকাশগঙ্গার মাঝের এই আলোহীন স্থান লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেই অংশকে রূপকাকারে তমসা রূপে বর্ণনা করেছেন। তাই শ্বেত শুভ্র সরস্বতী এখানে হয়েছেন ভদ্রকালী। (নিচে ছায়াপথ বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে ডার্ক রিভার অর্থাৎ তমসা নদীর চিত্র দ্রষ্টব্য)

ঋগ্বেদে বাগদেবী সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী, আমরা দুর্গা নামে তাঁর পূজা করি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহাসরস্বতীর ধ্যানে বলা হয়েছে,

"ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভিভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।"

এই পুরাণমতে চণ্ডী অর্থাৎ দুর্গা ও সরস্বতী অভিন্ন। বেদে হংস কথার অর্থ বলা হয়েছে আলোক। সরস্বতীর বাহন হংস, অর্থাৎ তিনি আলোর ওপর আরোহণ করে সুরগঙ্গায় ভেসে চলেছেন। সুতরাং দেবী সরস্বতীর বর্ণনায় যা জানা গেল তা হল,

দেবী কখনও দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা। তিনি শুভ্রা ও শুভ্রবসনা অথবা ভদ্রকালী রূপিনী। তাঁর হস্তে পুস্তক, বীণা, কমণ্ডলু ও অক্ষমালা। তিনি ত্রিনেত্রা, মস্তকে চন্দ্রকলা, হংসারূঢ়া।

সাধারণ মানুষ এবং প্রতিমা শিল্পী জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপট জানেন না, তাঁরা এই সমস্ত লক্ষ্মণ সম্বলিত নির্মিত-প্রতিমা পূজা করেন।

মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজা হয়ে থাকে। এই তিথি শ্রীপঞ্চমী তিথি নামেও চিহ্নিত। অমরকোষে "শ্রী" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী বলা হয়েছে। অমরকোষের বহুপূর্বে মহাভারতে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী-পঞ্চমী হিসাবে বিবৃত। মহিলারা ষটপঞ্চমী ব্রত পালন করেন বা করতেন। মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে ব্রত আরম্ভ করে ছয় বছর প্রতিমাসে শুক্ল পঞ্চমীতে ব্রত পালন করা হয়। মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে ছয় বছর পূর্ণ হয়। বলা হয় এই ব্রত পালনে নারী লক্ষ্মীসমা হন। ব্রহ্মপুরাণ মতে (৩৩৭ অঃ) লক্ষ্মীর কৃপা হলে সকল সম্পদ ও বিদ্যালাভ হয়। লক্ষ্মী ব্রহ্মশ্রী, যজ্ঞশী, ধনশ্রী, যশঃশ্রী, বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী ইত্যাদি সবই লক্ষ্মীর দ্বারা ব্যপ্ত।

আবার মৎসপুরাণে সারস্বত ব্রতের কথা বলা আছে। তেরো মাস শুক্ল পঞ্চমী ও কৃষ্ণ পঞ্চমীতে সারস্বত ব্রতের বিধি আছে। এই ব্রত করলে মধুরবাণী, জনসৌভাগ্য, স্মৃতি, বিদ্যায় কৌশল, দম্পতির ও বন্ধুর দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। এই ব্রতে বীণা অক্ষমালাধারিণী, কমণ্ডলু-পুস্তক হস্তা গায়ত্রীর অর্চনা করতে হয়। সরস্বতী ও গায়ত্রী কৃষ্ণ পঞ্চমীতেও অর্চনীয়া হয়েছেন। সম্ভবতঃ যে বছরে মলমাস যুক্ত হয়ে চান্দ্রবছর তেরো মাস দীর্ঘ হয়েছে, তেমন কোনও বছরে এই ব্রত সম্পন্ন হত। একাদশ খ্রিস্টিও শতকে হলায়ুধ কৃত "সম্বৎসর প্রদীপ" – এ বলা হয়েছে, "পঞ্চমাং পূজয়েৎ লক্ষ্মীং মস্যাধারং লেখনীঞ্চ।" অর্থাৎ পঞ্চমীতে লক্ষ্মী, মস্যাধার ও লেখনীর পূজা করবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী পূজাই বিহিত ছিল। কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই বিবেচিত হতেন। পরবর্তী কালে দুই শক্তিকে আলাদা ভেবে প্রথমে লক্ষ্মীপূজা ও পরে সরস্বতী পূজা বিহিত হয়েছে। দেব-দেবীর পূজার দিন নির্দিষ্ট করা আছে। ঠিক কবে থেকে সে পূজার প্রচলন হয়েছে তা বলা দুরুহ। দিন নির্দিষ্ট বলে সামাজিক অনুষ্ঠান সবাই একই সাথে পালন করেন।

পূজা, ব্রত ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার মূল অন্বেষণ করলে দেখা যায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রতিটি প্রথার মূলে একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা বা তথ্য নিহিত রয়েছে।

ধর্মকৃত্যের নিয়ামক যেহেতু স্মৃতি ও পুরাণ তাই বহু প্রাচীন প্রথার অস্তিত্ব রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই একটি প্রথার ওপর অপর একটি প্রথা সমাপতিত হয়েছে। ফলে প্রথা বা কৃত্যের মূল অন্বেষণে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

এর পর আগামী সংখ্যায়

চলচ্চিত্রে জীবনব্যাপী কৃতিত্বের জন্য ‘রেড লোটাস’ স্বীকৃতি পেলেন অপর্ণা সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি

রেড লোটাস এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৪-এ তাঁর সারা জীবনের কাজের জন্য ভিয়েনায় ‘রেড লোটাস’ স্বীকৃতি পেলেন অপর্ণা সেন। সম্প্রতি ভিয়েনার stadtkino প্রেক্ষাগৃহে পরিচালককে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। শংসাপত্রটি পাঠ করেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র আলোচক রুডিগার টমজ্যাক। আমরা শ্রীমতি সেনের সম্মানে পঠিত এই ইংরেজি শংসাপত্রটি সরাসরি পাঠকের জন্যে এখানে হাজির করলাম :

(সংশাপত্রটির বাংলা অনুবাদের জন্য এখানে ক্লিক করুন)

“Good afternoon,

I have today the pleasure and the honor to introduce and celebrate the films by Bengali film director Mrs. Aparna Sen about whose work I wrote about for 18 years. As you will see very soon Suman Ghosh´s documentary Parama: A Journey with Aparna Sen you will get a good introduction into

the many facets of her personality as an artist, actress or political activist, I allow myself to focus a bit on her as a filmmaker.

Just her first film 36 Chowringhee Lane, 1981,about an aging Anglo-Indian teacher called Violet Stoneham introduces the often lonely and isolated women we will find in most of her next films. But in this case, Ms. Stoneham is as well part of the vanishing minority, the Anglo-Indians which were discriminated by the British colonial power but later as well after the independence of India. The film introduced a new voice in cinema. Even though she was a young woman, she made with her first film one of the finest, but also one of the most heartbreaking film poems about aging and loneliness.

Aparna Sen considers her second film Parama, 1981 as her "most feministic film" Parama is about a frustrated middle aged married woman from the middle class who has an affair with another man. At the time the film was released, I heard that some people were disgusted about the fact that the heroine is an adulteress. Strangely, my sympathy was on Parama´s side – and that from the very beginning of the film.

What some of the contemporary audience have ignored is that Parama creeps through her rooms like a prisoner almost like a very unhappy ghost, always in danger to vanish completely. Her escapade is not adultery but a desperate try to define herself as a human being. On the other hand there is small, subtle but emphatic moment with Parama´s husband on a business trip far away from home. The kind the film shows his look at his secretary implies a sexualization by the male gaze. And there is no doubt that he would betray his wife if there is any occasion. If one calls Parama a feministic film than it is on a very high cinematic level. Aparna Sen never made films as a vehicle for ideologies, she completely translate ideas into a unique cinematic language. The perception of reality or how different it can be from person to person, will be one of the currents in her whole work. Of course – it has to do with the feministic aspects of her films but

as well with one of the fundamental questions of the art of cinema. If there is any justice in film history we will mention Parama in one breath with such iconic masterpieces of feministic cinema like Barbara Loden´s Wanda or Chantal Akkermans Jeanne Dielmann.

I realize with a bit of panic, that I am still at her second film knowing that I can´t focus on all films. With a heavy heart, I should mention at least her Film Sati which reminds me in its darkness a bit in Erich von Stroheim; or her apocalyptic masterpiece Yugant (What the Sea said), about a female artist who is struggling with her marriage, her independence as an artist amid images of pollution and destruction It is probably one of her most pessimistic films. Paramitar Ek Din/House of Memories for example is another proof that she is as well a great storyteller, in this case even dealing with different time levels. This Jumping between past and present will be one of her brilliant narrative strategies in some films like Iti Mrinalini /An Unfinished Letter or 15, Park Avenue. But Paramitar Ek Din includes as well one of the most tender relationship between women I can remember.

I deeply sympathize with the feministic aspects in all her films. But I always feel as well the urge in pointing out her brilliance as a filmmaker, her careful composed images, her arrangement of cinematic spaces. Yes, Mr. and Mrs. Iyer is also a film about communal riots, but it is as well a

firework of very sophisticated cinematic ideas. Without ignoring what Aparna Sen has to tell about the world, the relationship between men and women, I still like suggest that we should talk about her films with the implicitness like we talk about Godard, Malick, Ozu, Ford, Ray, Ghatak Scorsese, Hitchcock, Renoir and many others.

Aparna Sen said once something like All great art is androgynous, a sentence which hunted me for many years. In one of her finest films The Japanese Wife, we see for the first time in her films a man as the central protagonist, even though raised, influenced and surrounded by women. If there something like a male pendant to the passionate but tragic lover played by Mrs. Danielle Darrieux in Max Ophüls´ Madame De/The Earrings of Madame de - than it is Rahul Bose´s Snehamoy in The Japanese Wife.

Over the years, I had many conversations with Indian friends, men and women about Aparna Sen. While I enthusiastically celebrate her as one of my favorite filmmakers alive, I had to learn for example why she a role model for a lot of Bengali Women as an activist for human rights, her encouragement for the emancipation of women, her work as the editor of the women magazine Sananda (1986-2005), or as actress in commercial and Parallel Cinema but as as well as a stage actress.

What her films tell about the culture she is coming from, about the fatal state of the world lead to quite a few films which left me shocked, speechless and often with a broken heart. But there are as well moments of beauty, hope notions of happiness, sometimes even humor like in Goynar Baksho/The Jewelry Box or in this clash of comedy and tragedy in The Japanese Wife.

When there is a talk about famous filmmaker who are also well known for their cinephilia, most people think of Wenders, Scorsese or Bogdanovich. I would mention without hesitating a second at first Aparna Sen. Not only

because of her cinephile upbringing. Not that she is making a fuss about her high film education, nor can I remember a recognizable quotation from film history in her films. But I am hunted by so much great moments from her films which will stay with me as long as I breath. I will give a few examples:

Meenakshi sings in Mr. and Mr. Iyer a lullaby for her baby. This small moment has the beauty of a Japanese Haiku-poem; Another example is her adaptation of Tagore´s famous novel The Home and the World: She transferred the novel into the present India, governed by Right Wing Hindu fundamentalist party BJP: Even though it is one of her most disturbing and probably one of the bravest political film in recent times, there is the reconciliation scene between the couple in Ghawre Bairey Aaj /The Home and the World today which has the grace of a duet from a Mozart-Daponte-opera. There is an excursion of mother and daughter on the beach in Iti Mrinalini/An Unfinished Letter which has the grace of a film by Jean Renoir or Terrence Malick. These are moments of pure cinematic poetry and they can only come from a person who loves cinema.

At the end and when we honor Aparna Sen with the RED LOTUS Lifetime Achievement Award 2024. Let me express my hope that all her remarkable films will be one day screened in an integral retrospective with the best prints available. In the film Parama: A Journey with Aparna Sen you will

see some excerpts from her films. I hope this film by Suman Ghosh will arouse more interest in the films by Aparna Sen.

Thank you for your attention.

Thank you Aparna Sen for contribution for Indian and World Cinema.

Congratulation Madam."

রঙে রেখায় রাজপুতানা (তৃতীয় পর্ব)

আদিত্য সেন

নিবেদিতা ভাবল, কোথাকার এই হারিয়ে যাওয়া পথ বশিষ্ঠ আঁকছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হয়, যে রাজস্থানের কোনো বিধৃত ইতিহাস নেই, সেই জয়সলমেরও হতে পারে। যে পথ মুহূর্তে দেখা দিয়ে অতল বালিরাশির মধ্যে হারিয়ে যায়--সে শুধু জয়সলমের।

সেই কথাটাই প্রকাশ করল –

- ঠিক বুঝতে পারছি না কাকে আঁকছেন, তবে মনে হয় জয়সলমের-এর কথাই হবে।

- ঠিক বলেছ। আসলে তুমি ইতিহাসের প্রফেসর, আর আমি একজন সাধারণ শিল্পী। তুমি যে আমাকে ঠিক জায়গাটিতে ধরবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।
- অর্থাৎ, আপনিও আমার ছাত্র, কেমন ?
- যদি হইও, তাতেই বা কি এসে যায়?
- না, তা নয়। আমার জীবনে আপনি একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন !

- কেন বল তো ! অদ্ভুত কথা বল তুমি। বসো, বল আমেরিকার খবর কি?
- ইদানিং আমেরিকা সব দেশের ওপরেই মোড়লগিরি করে বেড়াচ্ছে। ওটুকু ছাড়া বিশ্বে আর কিছু যে ঘটছে, টের পাওয়া যায় না।
- কেন, তাসের ঘরের মত এক একটা ঘর ভেঙ্গে পড়ছে পূর্ব ইউরোপে
- সেও কি আমেরিকার কারসাজি নাকি?
- কিছু বলা যায় না। কায়েমী স্বার্থ বাঁকা চোখে পৃথিবীর সবুজ মুখের দিকে তাকায়
- তা বুঝি জানেন না? নিবেদিতা হেসে একটা চেয়ার টেনে বসল ।
- কি খাবে বল? ঠাণ্ডা না গরম?

হরিপদর ডাক পড়ল। সে এসে হালকা রগড়ে হাসি ছড়িয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ নিবেদিতাকে ওর ভারি পছন্দ।

অবস্থাটা বুঝেই বশিষ্ঠ একটু ধমকের সুরে বলল, "কি রে, বোকার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা ভাল করে দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়।"

হ্যাঁ যাই। হরিপদ চলে গেল।

- হরিপদ আপনাকে খুব ভালবাসে, না? নিবেদিতা উদ্ভট সব প্রশ্ন করে।
- তোমাকেও ওর খুব পছন্দ।
- কেন বলুন ত?
- তা নাহলে আমার আঁকার সময়ে তুমি ঘরে ঢুকতে পারতে নাকি ? কি ভেবেছ ওকে? ভীষণ প্রহরায় জীবনটা আমার অতিষ্ঠ করে তোলে।
- আপনার অভিযোগ শুনলেও হাসি পায়। কথাটা শোনাচ্ছে জনতা সরকারের মত। নিজের হুকুম কি ছিল, নিজেই ভুলে যায়। বীজ ফুঁড়ে যখন গাছ ওঠে–তখন বলে, এখানে ত গাছ হবার কথা ছিল না, শিল্প গড়ে উঠলে দেশের কল্যাণ হত। সেও আবার গাছ বলতে শুধু বোঝায় ইউক্যালিপটাস; এর খুব মজা, খরচা কম। আয় বেশি।

দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হাসির শব্দ ছড়াল বশিষ্ঠ। বলল, "ঠিকই বলেছ, পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বিষয় ত এটাই। আমাদের ভেতরের বীজ, বাইরে পল্লবিত হতে দেখে নিজেরাই চিনি না। না, নানা কথা বলে আসল কথাটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছ কেন? আমেরিকার খবর যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার ইঙ্গিতটা তুমি কি বোঝনি ?"
- বুঝেছি বই কি! এমন একটা সুন্দর দিনে ঐ প্রসঙ্গ তুলতে চাই না। বিশেষ করে আপনার ভাবনা যখন পাখা মেলে রঙ তুলি নিয়ে খেলছে–।

- তুমিও তো সেরকম একটা খেলা খেললে। মনে পড়ে সেই যখন শান্তিনিকেতনে তুমি পড়তে। তোমার মুখেই শুনেছি, প্রকৃতি, গাছ, পাথর, বীরভূমের লাল মাটি তোমাকে বেশি টানত। বোঝনি সে টান। অথচ ক্লাস ছেড়ে শুধু একা একা ঘুরে বেড়াতে।

একদিন নিবেদিতা যেন ওর জীবনটা শান্তিনিকেতনের লাল মাটিতে প্রতিবিম্বিত হতে দেখছে, এমনভাবে বলে যেতে থাকল কথার পৃষ্ঠে কথা সাজিয়ে-একদিন হঠাৎ-ই সেখান থেকে হাওয়া। বশিষ্ঠ জুড়ে দিল, "একেবারে সোজা কলকাতায় ।"
- হ্যাঁ, সেখান থেকে দিল্লী।
- তারপর যোধপুর-কয়েক বছর বাদে সোজা আমেরিকায়। তুমি যেন জীবন আর যৌবন চিত্রপটে এঁকে এঁকে চলেছ। তবে বন্ধু, এখানে এসে, এখানে এসে থামলে কেন?
- তার কারণ আমেরিকা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি বিন্দুমাত্র অবসর পাচ্ছি না। অতএব সেই সব ভুলচুক ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না।
- ভুলচুক বোল না, বল অভিজ্ঞতা। জীবনের যদি কিছু থেকে থাকে, সে শুধু অভিজ্ঞতা। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। হরিপদ, তুই যা--নিজের কাজ করগে যা। নিবেদিতা এলে তারই চারপাশে ছায়ার মত ঘুরতে চায়।

নিবেদিতা নিজের কাপটা হাতে তুলে এক চুমুক দিয়ে বলল, "হরিপদর চা-কফির হাতটা খুবই ভাল। মানুষকে ট্রেনিং দিতে আপনি ওস্তাদ।"
- আমি কিছুই বলি না। ভাল খারাপ আমার মুখচোখ দেখে বোঝে। দাড়ি-গোঁফের মুখটায় অত কি যে এক্সপ্রেশন দেখে, ও-ই জানে। নিবেদিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, “আমিও যেমন বুঝি ---"
- হ্যাঁ, ও কথা থাক। আমাকে বেশি বোঝ বলেই ত আমেরিকায় চলে গেলে। তবে এটাও ঠিক বর্তমান পৃথিবীর নারীসমাজের এক যোগ্য প্রতিনিধি আমেরিকায় যাবে না-

–তা কি কখনও হয়? কিন্তু তারপরে যে জিনিসটি করে ফেললে––সেই অঙ্কটা এখনও আমার গুলিয়ে যায় –

- শুধু আপনার ধাঁধা লাগে, আর আমার লাগে না? কৃষ্ণেন্দুকে আমি যে কেন বিয়ে করেছিলাম, কথাটা যখন একবার ভাবি, নিজেকে অদ্ভুত এক ক্রীতদাস মনে হয়। মেয়েরা বোধ হয় বন্ধন চায়, জট পাকাতে, জাল বুনতে ভালবাসে, নয়ত কৃষ্ণেন্দু কেমন করে আমার জীবনে এল, এখন ভাবতেও আমার অবাক লাগে। বশিষ্ঠ রসিকতা করল – "শত চোখে পৃথিবীর দিকে চাও তোমরা, তাই বোধ হয় ভুলগুলিও তোমাদের মারাত্মক হয়। "

- আজকে কৃষ্ণেন্দু থাক। অমন নিরস লোককে আমেরিকা থেকে টেনে আনতে আমার খুব কষ্ট হয়। তাই জোর করে ঐ এপিসোডটা ভুলে থাকি।

- বেশ, ভুলে থাকলেই যদি সমস্যা মেটে, আমিও আর কখনও সেই কথা তুলব না। তারপর ক্লাস, ইউনিভারসিটি কেমন লাগছে ?

- ভারতবর্ষের শিক্ষার ব্যাপারটা দোহাই আপনারা তুলবেন না। ওখানে কোন পরিবর্তন নেই। ঠিক যেন রাজস্থান। বশিষ্ঠ একটু গম্ভীর হয়ে রইল। পরে বলল, "সেবার যখন ভোটপর্ব শেষ হল, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ড্রইংরুমে আমি উপস্থিত ছিলাম। নামীদামী ব্যক্তিদের সঙ্গ আমি এড়িয়ে চললেও সেবার কি একটা কারণে যেন কাটাতে পারিনি। রাজস্থানের কথা উঠল। কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বললেন, " রাজস্থানের কথা থাক। ওখানকার পলিটিক্স ত একটা কথায় সারা যায়। পিছিয়ে-পড়া একটা ফিউডালিসটিক্ ব্যাপার।" ভাবলাম বলি – যা বাইরে থেকে আপনারা দেখেন, সেটাই রাজস্থান নয়। রাজস্থানের ভূমির পরিবর্তন উনিশটি স্টেট জুড়ে ইতিহাসের নানা পর্যায় পালটেছে। সেই পরিবর্তনটাকে তারা গায়ে মাখেনি; জীবনধারায় একটা স্বাভাবিক সুন্দর সৌন্দর্যবোধ বজায় রেখেছে- এটাই কি ওদের দোষ? উপলব্ধি নিজস্ব জিনিস – তাকে নিয়ে ড্রইংরুমে তর্ক করা চলে না।

- ওসব বাদ দিন। আপনার আঁকার কথা বলুন।

- কি আঁকছি জানি না। তবে জান এবার রাজস্থান নিয়ে যখন একবার মেতেছি, ভাবছি শুধু রঙ তুলি ভাবনা আর শব্দ নিয়ে খেলব। খেলাটা এগোচ্ছে না, এই যা মুশকিল। তবে ক্রিয়েটিভ ব্যাপারগুলি আমি একটু বুঝি। ওরা হল কৃষকের জাত। কৃষক যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, ভাবে কখন বৃষ্টি নামবে – তেমনি শিল্পী বা সাহিত্যিকরা সৃষ্টির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে – কখন সৃষ্টির ধারা সহস্র মেঘ নিয়ে আকাশ ছুঁয়ে ভাসবে ।

- অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আপনি ইন্‌টিউশন্টাকে বেশী প্রাধান্য দেন, কেমন?

- তা নয়ত কি! একটা প্রবন্ধের সঙ্গে কাব্যের তফাৎ যে ঐখানে। কিছু বই ঘেঁটে প্রবন্ধ লেখা যায় কিন্তু তুমি কি কখন শুনেছ, ভাল গ্রামেরিয়ান দারুণ একটা কাব্য

লিখেছে! কিংবা সে কী কোনদিন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ হতে পারবে? তোমার কি ধারনা? সৃষ্টির আদিম রহস্য আমার মনে হয়, আত্মবিশ্বাস, আর সেটা ছুঁয়েই মানুষের অন্তর রঙ তুলি বা কাব্যতে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। শিল্প নিয়ে যারা বাণিজ্য করে বা লেখা নিয়ে যারা বাণিজ্যে নেমেছে-- তারা এসব সূক্ষ কথায় আবার বিশ্বাসী নয়। বলবে, ওসব বাজে কথা । লেখাটা খুব মেকানিকাল জিনিস। লেখেও তেমনি ।

নিবেদিতা হাসল। ও যখন কিছু বলবে না তখন সেটা হাসি দিয়ে সারে। বশিষ্ঠের ধারণা নিবেদিতার হাসিতেই তার মুখের রঙ পালটায়। নিবেদিতা উঠে পড়ল। বলল, “আমি আজ চলি। এদিকে এসেছিলাম হঠাৎ-ই মনে পড়ল বাড়ি আছেন কিনা একবার দেখে আসি । “

বশিষ্ঠ দাঁড়িয়ে উঠে বলল--মাঝে মাঝে এরকম মতি হলে কাব্যটা বেশ জমে ওঠে, কি বল?
- সে আপনার ব্যাপার। আমরা ত নিরেট গদ্য। কাব্যের সরস ভূমিতে আমাদের চাষ চলে না।
- তা বটে। বশিষ্ঠ দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। নিবেদিতা রঙ ছড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ।

এর পর আগামী সংখ্যায়

শোমিন-গেকি

রুডিগার টমজ্যাক

‘বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীমতি অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্রগুলিকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং উদযাপন করতে পেরে আজ আমি প্রভূত আনন্দ ও সম্মান পেয়েছি। এই মানুষটির কাজ সম্পর্কে আমি ১৮ বছর ধরে লিখে এসেছি।

এখানে যারা উপস্থিত তারা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন সুমন ঘোষের 'ডকুমেন্টারি পরমা: এ জার্নি উইথ অপর্ণা সেন ' । আপনারা এই ছবিতে একজন শিল্পী অভিনেত্রী ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি দিক সম্পর্কে ভালো একটি পরিচয় পাবেন, তবু পাশাপাশি আমিও তার ব্যক্তিত্ব এবং

কাজের উপর কিছুটা ফোকাস করার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।

পরিচালক অপর্ণা সেনের প্রথম ছবি ৩৬ চৌরঙ্গী লেন হয় ১৯৮১ তে। এই ছবিতে ভায়োলেট স্টোনহ্যাম বয়স্ক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষক। তার ছবি একাকী এবং বিচ্ছিন্ন

মহিলাদের দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা আমরা তার পরবর্তী চলচ্চিত্র গুলিতেও দেখতে পাব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মিসেস স্টোনহ্যাম সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হওয়া সংখ্যালঘু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের অংশ, যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পরে, ভারতের স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই চলচ্চিত্রটি একই সঙ্গে দর্শককে বাংলা সিনেমায় এক নতুন কন্ঠের পরিচয় করিয়ে দেয়। অপর্ণা তার প্রথম ছবিটি তৈরি করেছিলেন এমন শক্তি দিয়ে যা তার কাজের মধ্যে এই ছবিকে সেরাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উপস্থাপিত করে। এবং বার্ধক্য ও একাকিত্ব নিয়ে এ ছবি হয়ে ওঠে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক চলচ্চিত্রে কবিতাগুলির মধ্যেও একটি অন্যতম সংযোজন।

তার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র পরমা তৈরি হয় ১৯৮১ তে। দর্শকরা এই ছবিকে তার সবচেয়ে নারীবাদী চলচ্চিত্র হিসাবে বিবেচনা করেন। ‘পরমা’ একজন মধ্যবিত্ত হতাশ মধ্যবয়সী বিবাহিত মহিলার ছবি তুলে ধরেছে যার অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। যে সময়ে ছবিটি মুক্তি পায়, শুনেছি, নায়িকা ব্যভিচারিনী বলে কিছু দর্শক বিরক্ত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় আমার সহানুভূতি পরমার পক্ষে ছিল --- এবং তা ছিল এ ছবির প্রথম প্রদর্শনের পর থেকেই। পরমা তার ঘরে একজন বন্দির মতো , প্রায় খুব অসুখী ভূতের মতো হেটে বেড়ায়, সর্বদা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। তার পলায়ন ব্যভিচার বলে মনে হয় না, বরং সে নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার মরিয়া চেষ্টা করে যায় আপ্রাণ। অন্যদিকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটি ব্যবসায়িক সফরে পরমা তার স্বামীর সঙ্গে ছোট সূক্ষ্ম কিছু জোরালো মুহূর্তের মুখোমুখি হয়। ছবিটি তার সেক্রেটারিকে যে ধরনের চেহারায় দেখায় তাতে পুরুষের দৃষ্টিতে যৌনতাই বুঝায়। কোন উপলক্ষ পেলেই সে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এতে কোন সন্দেহ থাকে না। যদি কেউ 'পরমা'কে নারীবাদী ফিল্ম বলেন, তাহলে

সেই সঙ্গে বলতে হবে যে এটি খুব উচ্চ সিনেমাটিক স্তরের সৃষ্টিও বটে। অপর্ণা সেন কখনোই কোনো বিশেষ মতাদর্শের বাহক হিসেবে ছবি তৈরি করেননি। তিনি ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে একটি অনন্য সিনেমাটিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বাস্তবতার উপলব্ধি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে কতটা আলাদা হতে পারে তা তার পুরো কাজের ধারায় আমরা বুঝতে পারি। অবশ্যই এছবি চলচ্চিত্রে নারীবাদী দিকগুলিআর সঙ্গে সম্পর্কিত আবার সিনেমা শিল্পের একটি মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত। যদি সিনেমার ইতিহাসে কোন ন্যায় বিচার থাকে তাহলে আমরা বারবারা লোডেনের ওয়ান্ডা বা চ্যান্টাল একরম্যান, বা জা ডিলম্যানের মত নারীবাদী সিনেমার আইকনিক মাস্টারপিসগুলোর সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে পরমাকে উল্লেখ করব।

আমি কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে বুঝতে পারি যে তার সমস্ত চলচ্চিত্রের বিষয়ে আমার যে ভাবনা তা এই পরিসরে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি অন্তত তার সতী চলচ্চিত্রের কথা উল্লেখ করতে বাধ্য যা আমাকে এরিক ফন স্ট্রোহেইমের কথা কিছুটা মনে করিয়ে দেয়। অথবা তার অ্যাপোক্যালিপিক মাস্টারপিস যুগান্ত – র কথা কিছুটা স্মরণে এনে দেয়। এই ছবি একজন মহিলা শিল্পী সম্পর্কে যিনি তার বিবাহ নিয়ে লড়াই করছেন। দূষণ এবং ধ্বংসের চিত্রগুলির মধ্যে এ ছবি একজন শিল্পী হিসেবে তার স্বাধীনতাকে তুলে ধরে। এটি সম্ভবত তার সব থেকে হতাশাবাদী চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি। উদাহরণস্বরূপ 'পারমিতার একদিন' হল আরেকটি প্রমাণ যেখানে তিনি একজন মহান গল্পকারও বটে। এই ক্ষেত্রে এমনকি বিভিন্ন সময় স্তরের সঙ্গে কাজ করে পরিচালক এখানে নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে জাম্পিং 'ইতি মৃণালিনী' বা '১৫ পার্ক এভিনিউ'র মতো কিছু চলচ্চিত্রে তার উজ্জ্বল বর্ণনামূলক কৌশলগুলির মধ্যে একটি হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পারমিতার একদিনের মধ্যে রয়েছে নারীর সবচেয়ে কোমল সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটি যা আমি মনে করতে পারি।

আমি তার সব ছবিতে নারীবাদী ভাবনার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছি। কিন্তু আমি সবসময়ই একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে তার উজ্জ্বলতা, তার যত্ন সহকারে কম্পোজ করা ছবি , তার সিনেমাটিক পেজগুলির বিন্যাস অনুভব করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ' মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার 'ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে একটি ছবি যা অত্যন্ত পরিশীলিত সিনেমাটিক ধারণার প্রকাশও বটে। অপর্ণা সেনের বিশ্ব, নারী-পুরুষ সম্পর্কে যা বলার আছে তা উপেক্ষা না করে আমি এখানে পরামর্শ দিই যে আমরা যেন তার চলচ্চিত্রগুলি সম্পর্কে কথা বলতে উৎসাহী হই। যেমন আমরা গোদার, অজু ফোল্ড রায় ঘটক হিচকক স্কোরসেস রেনোয়া এবং আরো অনেকের বিষয়ে বলে থাকি।

অপর্ণা সেন একবার বলেছিলেন all great art is androgynous । এই বাক্যটি আমাকে বহু বছর ধরে ভাবিয়েছে। তার সেরা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি হল দ্য জাপানিজ ওয়াইফ। আমরা তার চলচ্চিত্রগুলিতে প্রথমবারের মতো একজন পুরুষকে কেন্দ্রীয় নায়ক হিসেবে এখানে দেখতে পাই। ম্যাক্স ওফুলসের ম্যাডাম দে/ দ্য ইয়ারিংস অফ ম্যাডাম দে ছবিতে মিসেস ড্যানিয়েল দ্যারিউক্স অভিনীত আবেগপ্রবণ কিন্তু ট্র্যাজিক প্রেমিকের কাছে পুরুষের দুলের মতো কিছু থাকলে তা হত জাপানিজ ওয়াইফ – এ রাহুল বোসের স্নেহময়তা।

বছরের পর বছর আমি অপর্ণা সেন সম্পর্কে ভারতীয় বন্ধুদের, ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলাদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি। যখন আমি তাকে আমার প্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসাবে চিহ্নিত করছি তখন আমাকে জানতে হয়েছিল যে তিনি কেন অনেক বাঙালি মহিলার জন্য আদর্শ। একজন মানবাধিকার কর্মী হিসাবে নারী মুক্তির জন্য তার উৎসাহ, নারী পত্রিকার সানন্দার সম্পাদক হিসেবে তার কাজ, বাণিজ্যিক এবং সমান্তরাল সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার কাজের পাশাপাশি তিনি একজন সফল মঞ্চ অভিনেত্রী।

তার ছবিগুলি যে সংস্কৃতি থেকে সে আসছে তার সম্পর্কে যা বলে তা হল বিশ্বের মারাত্মক অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু ছবির এ নেতৃত্ব দেয়, যা আমাকে হতবাক বাকরুদ্ধ করে রাখে। তবে সৌন্দর্যের মুহূর্তগুলি, সুখের ধারণা, কখনো কখনো গয়নার বাক্স-র মতো ছবি বা জাপানিস ওয়াইফের কমেডি এবং ট্রাজেডিকর এই সংঘর্ষের মধ্যেও রয়েছে।

যখন কোন বিখ্যাত ফিল্মমেকার সম্পর্কে বলা হয় যে তারা তাদের সিনেফিলিয়ার জন্যও সুপরিচিত তখন আমরা বেশির ভাগই ওয়েন্ডার স্কোরসেস বা বোগদানোভিচের কথা বলি। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে প্রথম অপর্ণা সেনের কথা মুহূর্ত দ্বিধা না করে উল্লেখ করব। করব শুধুমাত্র তার সিনেফিল লালন পালনের কারণেই নয়, এমনও নয় যে তিনি তার উচ্চ চলচ্চিত্রের শিক্ষা নিয়ে ঝগড়া করছেন, বা আমি তার ছবিতে চলচ্চিত্রে ইতিহাস থেকে একটি স্বীকৃত উদ্ধৃতি মনে করতে পারি না। কিন্তু আমি তার ছবি থেকে অনেক দুর্দান্ত মুহূর্ত উপহার পেয়েছি, যা যতক্ষণ আমি শ্বাস নেব ততক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দেব। যেমন , মীনাক্ষী মিস্টার অ্যান্ড আইয়ারে তার সন্তানের জন্য একটি লুলাবাই গেয়েছেন, যে মুহূর্তটিতে একটি জাপানি হাইকু কবিতার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। আরেকটি উদাহরণ হল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস দ্য হোম এন্ড দা ওয়ার্ল্ড এর রূপান্তর। তিনি দক্ষিণপন্থী হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপি দ্বারা শাসিত বর্তমান

ভারতে উপন্যাসটিকে স্থানান্তরিত করেছেন। এটি তার সবচেয়ে সাহসী এক সৃষ্টি। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক ছবি ঘরে বাইরে আজ/ দ্য হোম অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডে এক দম্পতির মধ্যে মিলনের দৃশ্য রয়েছে যাতে একটি মোজার্ট অপেরার দ্বৈত গানের অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। ইতি মৃণালিনী ছবিতে সমুদ্র সৈকতে মা এবং মেয়ের একটি ভ্রমণ দেখানো হয়েছে যা জ রেনোয়ার একটি চলচ্চিত্রের ছায়া বহন করেছে। এগুলি খাঁটি সিনেমাটি কবিতার মুহূর্ত এবং এগুলি কেবল সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আসতে পারে যিনি সিনেমাকে ভালবাসেন।

শেষে এবং যখন আমরা অপর্ণা সেনকে রেড লোটাস লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড ২০২৪ এর মাধ্যমে সম্মানিত করি তখন আমাদের ভাবনাও কোথাও জয়ী হয়। আমি আশা করি যে একদিন না একদিন তাঁর সমস্ত অসাধারণ চলচ্চিত্র নিয়ে একটি রেট্রস্পেকটিভ প্রদর্শিত হবে, এবং সেরা প্রিন্ট পাওয়া যাবে। পরমা : এ জার্নি উইথ অপর্ণা সেন ছবিতে আপনি তার চলচ্চিত্রের কিছু অংশ দেখতে পাবেন। আশা করি সুমন ঘোষের এই ছবিটি অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্রের প্রতি আরো আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে।

মনোযোগের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

ভারতীয় এবং বিশ্ব চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য অপর্ণা সেনকে সাধুবাদ জানাই।

অভিনন্দন ম্যাডাম । "

‘চালচিত্র এখন’ – অঞ্জন দত্তের সার্থক ভাবঘন ট্রিবিউট

যশোধরা রায়চৌধুরী

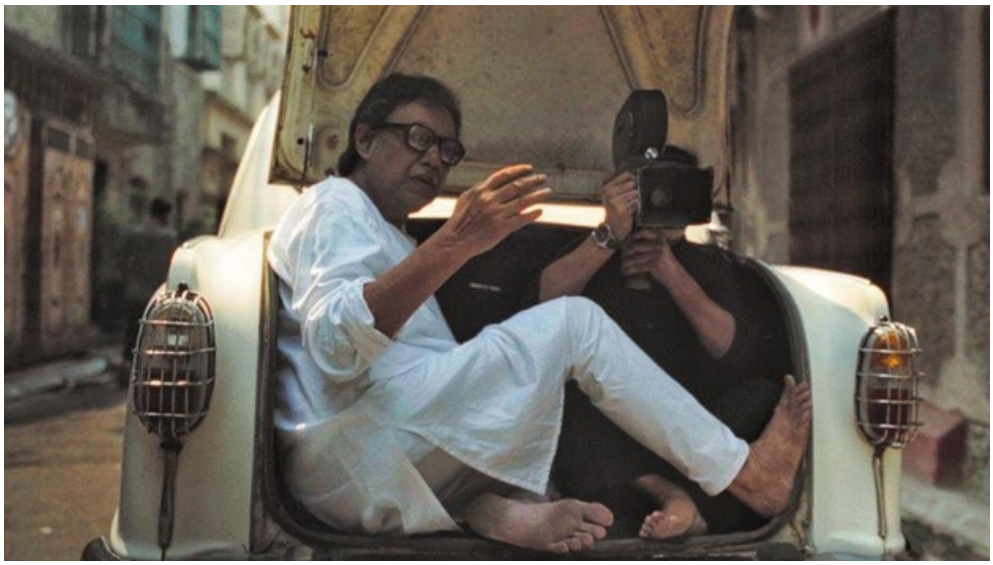

(উইকি সূত্র থেকে – ‘চালচিত্র এখন’ ২০২৪ সালের একটি বাংলা ভাষার ভারতীয় ঐতিহাসিক নাট্য চলচ্চিত্র। মৃণাল সেনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অঞ্জন দত্ত চলচ্চিত্রটি পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্য, গল্প, অভিনয় ও সুরারোপ করেছেন। অঞ্জন দত্ত প্রডাকশন-এর ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন অঞ্জন দত্ত ও নীল দত্ত। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাওন চক্রবর্তী, অঞ্জন দত্ত, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, সুপ্রভাত দাস ও শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়। এটি ২০২৪ সালের ১০ মে নির্বাচিত কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে এবং ওটিটি প্লাটফর্ম হইচই-তে মুক্তি পায়। মৃণাল সেনের বসবাস করা বাড়িতে চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ হয়েছে। মৃণালের ‘চালচিত্র’ সিনেমার কিছু দৃশ্য বেলেঘাটার আরেকটি বাড়িতে অঞ্জন দত্ত পুনর্নির্মাণ করেছেন ।)

মৃণাল সেনের শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে বাংলা দর্শকের কাছে এসে পৌঁছল ‘চালচিত্র এখন’ নামে একটি ছবি। অঞ্জন দত্ত তার পরিচালক। অঞ্জন দত্তের ছবির সাথে আমরা যারা পরিচিত তারা সবাই, ওই ঘরানায় কিছু শতাংশ মজা কিছু শতাংশ জ্ঞান দেওয়া, অনেকটা গান আর বেশ কিছুটা প্যাশন, পাগলামি, আদর, যাহোক কিছু... এই ভেলপুরিটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অঞ্জন দত্তর সিনেমাকে ইংরেজিতে যাকে বলে কোয়ার্কি তা বলাই যায়, খুব সিরিয়াস মুখোশ পরে তা আমাদের কাছে আসেনা, এবং প্রচুর, বিস্তর ইংরেজি কথা ব্যবহার করে প্রতি ছবির কুশীলবেরা। তারা গ্যারাজে গান গায়, অন্য সময়ে ভালবাসে বা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করে।

এই ছবিটি দেখতে বসে আমরা একটা প্যাকেজের মত অঞ্জন দত্তসুলভ সেইসব জিনিস ত পেলামই, যে জিনিসগুলো দেখলে এক রকমের চেনা চেনা বিরক্তি ও হাসি আসে আবার ওই চেনা বলেই অঞ্জনের তরুণ তুর্কি চরিত্রদের আমরা একটু ভালও বেসে ফেলি। কিন্তু তথাপি, চালচিত্র এখন ছবিটিতে রঞ্জনকেও সেইরকম করেই আঁকা হওয়া সত্ত্বেও আরো অনেকটা কিছু পেলাম। যা আমাদের তড়িদাহত করল, আবিষ্ট করল, মুগ্ধ করল তা হল অঞ্জন দত্তের সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়ে অভিনয়, কুণাল সেন নামের এক চরিত্রের মধ্যে। যার আধার আসলে মৃণাল সেন। ঈষৎ বয়স্ক, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মধ্যবয়সী, দীর্ঘকায়, মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা... একটি আর্কিটাইপাল মৃণাল সেনই শুধু অঞ্জন অবয়ব দেন নি, হাজির করেছেন তাঁকে নিজের সবরকমের আলতো খ্যাপামি, সিনেমার জন্য জান লড়ানোর এনার্জি, ক্ষণে ক্ষণে স্ক্রিপ্ট পাল্টানোর অপ্রত্যাশিততা সহ। আবেগঘন, একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে। পর্দায় অঞ্জনকৃত মৃণাল তথা কুণালকে দেখতে দেখতে ভ্রম হয়, আসলেই মৃণাল সেনকে দেখছি কিনা। ইতিহাসের অংশ মৃণাল সেন , তাঁর বাড়ি, সত্তর বা আশির দশক-এর আসবাব, কালো কোলাব্যাং টেলিফোন সবকিছু সহ।

মৃণাল সেন নামক এক চিত্র পরিচালক, যিনি এই সেদিন অব্দি বেঁচে ছিলেন, এখন যাঁর ১০০ বছর হয়েছে কিন্তু যাঁর তৈরি চলচ্চিত্রগুলোর ফ্রেম এখনো আমাদের বিস্মিত করছে, এই সেদিন সৌমিত্র-কণিকা-কালী-এন বিশ্বনাথন অভিনীত একটি ছবি "পুনশ্চ" রিমাস্টার্ড হয়ে হইচইতে আসার পর দেখতে দেখতে মনে হয়েছে তা যেন সাদাকালোতে কলকাতার কাব্য... সেইসব চলচ্চিত্রগুলো আজো ধারালো, কিছুটা স্পর্শ করে যায়... যদিও তাতে বামপন্থার দিকে ঝুঁকে থাকার চিহ্নগুলি স্পষ্ট, তবু... এই মৃণাল সেনকে কুণাল সেন নামে প্রতিষ্ঠা দেওয়া

হয়েছে , শুধু তাই নয়, এক তরুণ রঞ্জনকে দেখা গেছে যাকে ওই কুণাল সেন ডেকে নেন নিজের ছবিতে ডেব্যু রোল দেবার জন্য...। দার্জিলিং থেকে আসা রঞ্জন ট্যাঁশ, পেছনেপাকা, সর্বদা লেকচার ঝাড়ে, বন্ধুদের সাথে কঠিন কঠিন নাটক করতে চায়, ম্যাক্সম্যুলার ভবনের সহায়তায় যেতে চায় জার্মানিতে নাটক নিয়ে কাজ করতে। জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে অথচ সে বিয়েও করে ফেলেছে হঠাৎ। কিছুদিন খবরের কাগজে কাজের সূত্রে সে একবার মৃণাল সেনের কাছে গিয়েছিল সাক্ষাৎকার নিতে, তাঁর একটিও ছবি না দেখে।

ছবিটি নস্টালজিয়ার ওপরেই শুধু খেলেছে ভাবলে ভুল হবে। বাঙালি নস্টালজিয়া ভাল খায় বলে শুধু সেটুকু দিলেই সে খুশি, এমন সরল নয় অঞ্জনের এই ছবি । এটি তাঁর অভিনেতা জীবনের গুরু অথবা বলা যায় তাঁর অভিনেতারূপে পুনর্জন্ম দেওয়া পিতার প্রতি পুত্রের সঘন আবেগময় ট্রিবিউট বলেই, খুব অর্গ্যানিকভাবে এগিয়েছে। এবং স্পর্শ করে গেছে হৃদয়ের তন্ত্রী। বিশেষত গীতা সেনের আদলে সীতা সেন যখন অভিনয়ও করেন আবার শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে সংসারের সমস্ত রান্নাবান্নাও করেন, চিকেন না বলে বলেন মুরগির মাংস রান্না করেছি, এবং প্রতিপদে তরুণ রঞ্জনকে সন্তানস্নেহে বলেন, খেয়ে যেও; , বিদীপ্তা চক্রবর্তীর অভিনয়ের জন্যেই শুধু না, আমরা যাঁরা সত্তর আশিদশক স্বচক্ষে দেখেছি তারা অনুভব করতে পারি এই দেখা কতটা সৎ। নারী চরিত্রগুলি মৃণালের ছবিতে হত অত্যন্ত জোরালো ও দীপ্ত। আর অঞ্জনের ছবিতেও তাইই। এই সীতা সেনের জন্যও এই ছবিটিকে অনেকদিন মনে রাখব। চিনির কৌটো মাটিতে ফেলে কাজ বাড়িয়ে দেওয়া রঞ্জনকে তাঁর ভর্ৎসনা বুকের ভেতরে গিয়ে একটা পুরনো আদল আনে, লিপস্টিক চর্চিত, চিবিয়ে ইংরেজি বলা অভিনেত্রী

নয়, আটপৌরে জীবনে, কুণাল সেনকে হুট করে পরিকল্পনাহীনভাবে বিয়ে করে ফেলা লড়াকু ও স্বপ্নদেখা একটি মেয়েকে সম্পূর্ণ দেখায়।

মৃণালে ছায়া হিসেবে অঞ্জনকৃত কুণাল অ্যামবাসাডরের ডিকিতে শুয়ে শ্যুটিং করেন, কিছুমাত্র না ভেবে অভিনেতাদের ডিক্টেট করেন, দুমদাম স্ক্রিপ্ট পালটান, বকাবকি করেন। তাঁর ম্যানেজারের ছোট্ট চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। । তিনিও সবাইকে খাওয়াতে উদগ্রীব। সেই সময়ের ফিল্মে কাজ করা মানুষদের জীবনের একটা ঝলক উঠে আসে। যেখানে, রোজ ভরপেট খেতে পাওয়াটাই একজন সিনেমাকর্মীর পক্ষে প্রায় স্বপ্ন, সেখানে শুটিং এর কটি দিন পাত পেড়ে ভাত মাছ মাংস খাওয়ানোর তৃপ্তি এই ছোট চরিত্রের থেকে চুঁইয়ে নামে। ছবিতে ভবানীপুরের পুরনো বাড়ির ছাত সিঁড়ি বসবার ঘরও চরিত্রের মত উপস্থিত। অভিনয় করতে বারণ করার দৃশ্যে কুণাল সেনের ইলোকুয়েন্স, বুঝিয়ে বলা, ক্যামেরা সিনেমাটোগ্রাফি কত পারসেন্ট দেবে আর অভিনেতা কত পারসেন্ট, এক কথায় অপূর্ব। তবু, ছবিতে অনেক ত্রুটি আছে। সবকিছু পাল্টাতে গিয়ে কুণালের সীতাকে উত্তরপাড়া পৌঁছবার জন্য ট্রেন ধরানো হাওড়া থেকে শেয়ালদায় সরে গেছে। শেয়ালদা দিয়ে উত্তরপাড়া যাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সেটা ঘুরপথ। বাস্তবে মৃণাল হাওড়াতেই যেতেন প্রতিদিন, তাঁর আত্মজীবনীতে পাই। তেমনই, রঞ্জনের পথে পথে বসে থাকার ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ডের কলকাতায় হলুদ সবুজ অটো চলে, কলকাতার তৃণমূল জমানার পরবর্তী নীল সাদা বেড়া দেখা যায়। সত্তর বা আশির দশকের চিত্রায়ণের দিকে আলাদা করে যেন পরিচালকের কোন মন নেই।

কমিউনিজম খুব বড় আলোচনার বিষয় ছিল সত্তর আশির দশকে। বামপন্থা, কম্যুনিস্টরা, লেনিন স্তালিন, মার্ক্স, এইসব মিলিয়ে আদর্শবাদের জায়গা থেকে বাঙালির ভাবনামন্ডলে খুব বড় বিতর্কগুলোকে বালখিল্য করে উপস্থাপিত করার কাজেও অঞ্জন দত্ত সফল। তবু, তাঁর করা কুণাল সেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়গুলোর মধ্যে একটা হয়ে থাকবে। রঞ্জনের চরিত্রে নবাগত শাওনের অভিনয় সে তুলনায় মেলোড্রামাটিক ও কিছুটা কাঁচা। কিন্তু যৌবনের ধর্মগুণে মানিয়ে গেছে।

ক্যালিডোস্কোপে আকাশের ছায়াছবি

রুডিগার টমজ্যাক

অঞ্জন দত্তের ‘চালচিত্র এখন’ ছবি নিয়ে ‘বাংলা স্ট্রিট’ -এর জন্য সরাসরি কলম ধরলেন জার্মানি থেকে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যতম চলচ্চিত্র আলোচক

Something like a review

The film is very much at the same time. It is a chapter from the biography of one of the most important Bengali film directors Mrinal (called in this film Kunal) Sen, who was a mentor for Anjan Dutt. But it is also a film about the first encounter of these two man. Even though the time is not explicit mentioned, it is 1980 when Sen casts the young Anjan (called in this film Ranjan) for his film Chaalchitra (Kaleidoscope). In this sense it is Dutt´s second autobiographic film which begins where Dutta Vs Dutta ends. But it is as well a film about Kolkata.

We see them while shooting the film and often in long discussions. Beside discuusions about their different ideologies and the work on the film, there are moments when they talk more privately, about their families or for example how Sen became a filmmaker. These moments are hints that the relationship between the two men goes beyond a relationship between mentor and protege and it seemed to be something like these simple mundane but

nevertheless poetic moments one can find in the films by Ozu and Ford. Like I mentioned the other protagonist is the city itself.

Anjan Dutt played in his own films often very difficult, alienated and failed fathers or father-like characters. In this film he plays Kunal (Mrinal) Sen another father-like figure but exactly the positive opposite of the father in Dutta Vs Dutta (also played by himself, an aspect which connects and distinguishes these two films at the same time.

Sawon Chakraborty plays the young Dutt. Both performances moved me in different ways. Dutt´s portrait of Sen seems to happen completely out of his memory in his mentor without mimicking and without hyperbolic make-up. Sawon Chakraborty seems to me very credible as the lanky young man. There is for example the funny habit of Sen to collect match boxes. When I saw this film for the first time I enjoyed the affectionate humor. At the first sight I did not feel the same melancholy like I sensed in his Dutta Vs Dutta or Aami Ashbo Phirey. But when I saw it for the second time, I realized that the songs had as well subtitles (only one of them is sung in English) which changed my mood and changed my perception of this film.

There are two different alienation effects in this film. The one, often tangible in the shooting programme (which take places on non-designed real streets, in cars , trams and lanes and recorded with handheld cameras). Sometimes freeze frame shots interrupt the flow and suspend for a moment the cinematic illusion of movement, the film is for seconds reset to its primordial state, the photograph. This alienation effect reminds me in some films by Mrinal Sen. But since I watched the film again, I discovered a second and very different alienation effect which I connect rather with Anjan Dutt. The wonderful songs by Anjan and Neel Dutt might be the most popular elements in all films by Anjan Dutt. But the songs were always interwoven with care and very thoughtful into into the architecture of his films, as coordinates for orientation in the artificial spacetime of Dutta Vs Dutta or more experimental as another level of perception in Aami Ashbo Phirey or Finally Bhalobasha.

The lyrics from the songs used in Chaalchitra Ekhon suggest a retrospective perspective, from another time rather our present than the passed time of the film´s narration. During this songs, the film sometimes digresses from the narration into lanes, market places or river banks etc. The narrative flow is interrupted and suspended for a moment. But sometimes they seem as well here the pendant to Anjan Dutt´s voice over narration in Dutta Vs. Dutta. While watching the film again, I laughed a bit less and felt a bit more the melancholuc under current. The film becomes more a memory of a time and especially of a person who is already missed. It is rather a personal, poetic cinematic epitaph. And those we miss, we sometimes remember with a smile.

There is a great moment which gives an image about the visual imbedding in Kolkata´s urban landscape. Ranjan Dutt and Kunal Sen are discussing on Sen´s balcony. Later we see them on the balcony from the streets in a long shot. The two characters appear now a living part of the city´s architecture. That is almost an Edward Hopper-moment.

My experience with this film

"I celebrate myself
and sing myself
And what I assume
you shall assume
For every atom
belonging to me
as good as it
belongs to you."
(Walt Whitman, Song of Myself, published in Leaves of Grass)

While writing my review on this film, I came across of a lot of reactions, most of them share my enthusiasm, few of them are more reluctant reviews. Especially the more reluctant with which I can not agree made me thinking about a general problem of film criticism, the judgmental and often smart-alecky perspective. What is the right language one uses when one loves a film with skin, hair and bones despite its highly sophisticated alienation-effects?. It is relatively easy for me to articulate from the safe place of a reviewer why Chaalchitra Ekhon is a great film but I still think there is more and I am often too shy to articulate when films goes much deeper than for example satisfying the vain connoisseur in me. The kind this film evokes intense emotions and the kind the film haunts me uncalled for days, sometimes weeks, asks for a more personal perspective. Through the films by Ritwik Ghatak and Terrence Malick (from up to 2011), I got a strange awareness of vulnerability which stands often side by side with what we call great art. I could mention other examples, but this would be a completely different story. Moments in films which let me lose very easily the control over my emotions and which are burnt in my memory are the ending of Dutta Vs Dutta and Chaalchitra Ekhon. The faces who hunt me have nothing designed anymore (they seem often like modern version of Dreyer´s presentation of human faces in La Passion de Jeanne d´Arc) the emotions evoked by these moments hit me in their vulnerability. I experienced these moments as what I want to call cinematic singularities, strong moments of truthfulness in which the critic or the connoisseur in me is suspended for moments. Usually my cinephilia works like that: I watch, some moments evoke emotions in me or memories and I entrust the film with my innermost feeling like in a confesstional box or during a therapy session. But there are also experiences with films where this discreet intermediate area is more variable or even unstable. The faces, for example of Anjan Dutt or Sawon Chakrabory, are exposed, last but not least through the non-human but precise and often merciless non-human gaze of the camera. Is the exhaustion we see in these faces the performed exhaustion or do they include signs of exhaustion of the performers themselves or probably both together?

Like I suggested how the songs are integrated in Chaalchitra Ekhon, make this film a kind of very personal obituary on Mrinal Sen. The scene when the young Ranjan hugs Kunal/Mrinal Sen clumsy and cries in his arms is for me one of these strong moments where the awareness of just watching a film disappears for a moment. This images goes far beyond a mark of respect of a protege towards his mentor. It is a gesture of love of a young man for an elder man he wished to have as a father and who finally enables him to find his own path. While seeing this moment the end of Dutta Vs Dutta in my mind like a phantom image. Before this scene the voice over of Anjan Dutt resumes that no one from the family he was born in will ever see his films. This moment suspends again the artificial spacetime continuum of the film for a moment. Later we see this other "hug-scene". Here, Anjan Dutt plays his real father called Biren in this film. Biren has lost everything. He is a very sick man, hardly able to move and unable to speak. The relationship the son (Ronno/Anjan Dutt´s Alter Ego as a young man)) had with his father was difficult. Now, he can not do anything but forgive this godforsaken lost soul with a last hug, the last gesture of love he can offer.

Shall I praise this work Chaalchitra Ekhon forged with the heat of life,- and art experiences or shall I praise the heat which made such films possible at all? Often , my most intense experiences with a film force me to admit that I don´t know nothing anymore at all. There is no question that personal filmmaking today is a big challenge. Despite the amount of work which is necessary, the sweat and the stress, Chaalchitra Ekhon looks appears like radical Caméra Stylo, written down and filmed like felt and thought, honest and authentic to the bones.

টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মিলবে না আই পি এল দলের অনেককেই

কমল সোম

ঘোষণা হয়ে গেছে অথচ এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে আইপিএলের ১০টি দলের মধ্যে চারটি দলের কোনও ক্রিকেটারই নেই । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতা নাইট রাইডার্স। যাদের নিয়ে নানা পর্যায়ে তুমুল আলোচনা চলছিল সেই রিঙ্কু সিংহ, শ্রেয়স আয়ারদের বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেরই চার জন ক্রিকেটার বিশ্বকাপের দলে জায়গা পেয়েছেন। কোন দলের ক' জন রয়েছেন বিশ্বকাপের ১৫ জনের দলে ?

বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে যে দল ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সব থেকে বেশি ক্রিকেটার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও সহ-অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য দু' জনেই মুম্বইয়ের। রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব ও যশপ্রীত বুমরা। রাজস্থান

রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে তিন জন করে ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। রাজস্থানের তিন ক্রিকেটার হলেন– যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন ও যুজবেন্দ্র চহাল। দিল্লির তিন জন হলেন– ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব ও অক্ষর পটেল।

চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দু' জন করে ক্রিকেটার ভারতের বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেয়েছেন। চেন্নাইয়ের রবীন্দ্র জাডেজা ও শিবম দুবে এবং বেঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি ও মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন ১৫ জনের তালিকায়। পঞ্জাব কিংসের আরশদীপ সিংহও রয়েছেন বিশ্বকাপের দলে।

আইপিএলে যে চারটি দলের কোনও ক্রিকেটার ভারতের বিশ্বকাপের দলে নেই তাদের মধ্যে কেকেআর ছাড়া বাকিরা হল গুজরাত টাইটান্স, লখনউ সুপার জায়ান্টস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। চলতি আইপিএলে কেকেআর ও হায়দরাবাদ দাপট দেখাচ্ছে। কিন্তু তার পরেও তাদের বাদ রাখা হয়েছে।

বিশ্বকাপের ১৫ জনের দলের বাইরে চার জন ক্রিকেটারকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়েছে। তাঁরা হলেন– কেকেআরের রিঙ্কু সিংহ, গুজরাতের শুভমন গিল, দিল্লির খলিল আহমেদ ও রাজস্থানের আবেশ খান। কিন্তু তাঁরা মূল দলে নেই। কোনও ক্রিকেটার চোট পেলে তবেই বিশ্বকাপের মূল দলে সুযোগ পাবেন তাঁরা।

অন্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

যাত্রা শুরু করল লিটল কলেজ স্ট্রিট

কলকাতার কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার উদ্বোধন করলেন বইয়ের নতুন দোকান 'লিটল কলেজ স্ট্রিট'। রবীন্দ্র জন্মমাসের শুরুতে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্য দিয়ে তিনি এই অভিযাত্রার শুভ সূচনা করেন। 'লিটল কলেজ স্ট্রিট' কলিকাতা লেটারপ্রেস সহ অন্যান্য প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নতুন বিপণন কেন্দ্র। বইয়ের বিপণনের পাশাপাশি এখানে পাওয়া যাবে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের গ্রামীণ হস্তশিল্পের সুনির্বাচিত সংগ্রহ। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থিরচিত্র প্রদর্শনের গ্যালারি এবং ছোটো ছোটো আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ, বই প্রকাশ, লাইভ অনলাইন অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্যে উপযুক্ত একটি সভাস্থলও রয়েছে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের স্বাস্থ্য শিবির

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন্ ফেডারেশন-র উদ্যোগে শুরু হয়েছে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ শিবির। প্রতি মাসে আয়োজিত এই শিবিরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবারের মতো এ মাসের শিবিরেও উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে 'সেরাম অডিটোরিয়ামে' প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত মানুষের চিকিৎসা করেন এবং বিনামূল্যে তাদের হাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ওষুধ তুলে দেন।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন